অবাঞ্ছিত উইল

কাসেম বিন আবুবাকার

অবাঞ্ছিত উইল
কাসেম বিন আবুবাকার

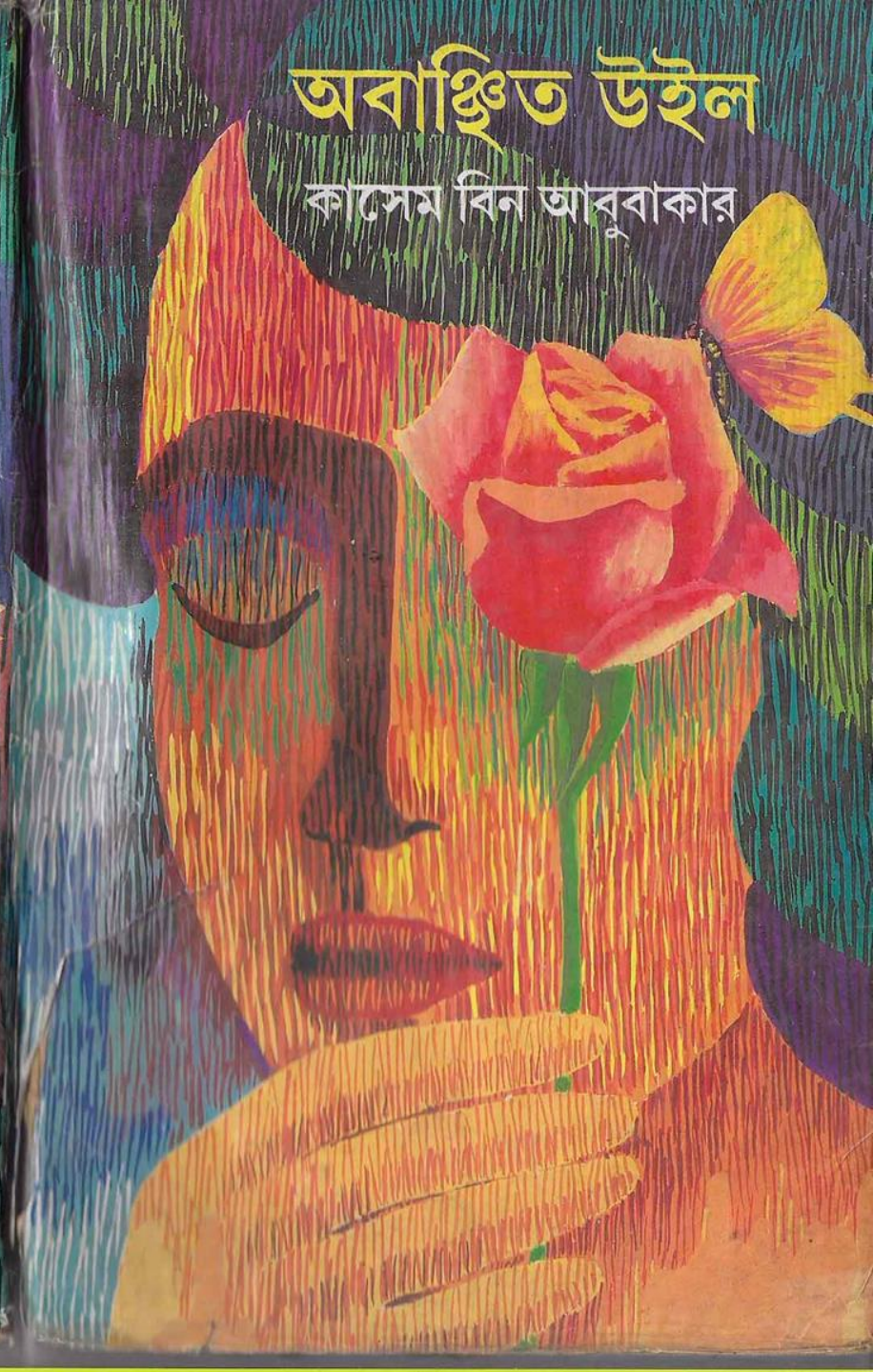

ভূমিকা

শুকরিয়া আদায় করছি সেই মহান প্রভুর যাঁর অপার করুণায় আমি এই উপন্যাস খানা লিখতে সক্ষম হলাম। সেই সঙ্গে তাঁর হাবিবে পাকের রওজা মোবারকে শতশত দরুদ ও সালাম পেশ করছি।

সৃষ্টিকর্তার অপর দান প্রেম-প্রীতি, এই উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার মধ্যে অংকুরিত হয়েছিল। নায়কের মধ্যে তার শিকড় বিস্তার লাভ করলেও দুর্ভাগ্যক্রমে সামান্য একটা মিথ্যা ঘটনাকে কেন্দ্র করে নায়িকার অংকুরিত বীজ ঘৃনা ও বিদ্বেষে পরিণত হয়। আবার এক অবঞ্চিত উইলের মাধ্যমে কিভাবে তাদের মিলন হল তারই বাস্তব ঘটনা নিয়ে এই উপন্যাস। আর একটা জিনিস এই কাহিনীর মুখ্য, ধর্মীয় জ্ঞান ও তার অনুশীলন যে মানুষকে মঞ্জিল- মোকসুদে পৌঁছে দেয়, এই উপন্যাসটা তারই এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

আশা করি পাঠকবর্গ এই উপন্যাসখানা পড়ে উল্লিখিত কথাগুলো সত্য মিথ্যা বুঝতে পারবেন। সেই সঙ্গে কিছু আনন্দ ও বেদনা পাবেন এবং অল্প কিছু হলেও ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করে তার অনুশীলন করার প্রেরণা অনুভব করবেন।

ওয়াস সালাম
লেখক-
৯ই চৈত্র-১৯৯৮ বাং
১৮ ই রমজান-১৪১২ হিঃ
২৩ শে মার্চ-১৯৯২ ইং

এক

ইয়াসিন সাহেব বেশ গম্ভীর স্বরে বললেন, আপনার ভাগিনার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেব না। আপনারা চলে যান।

আরমান সাহেব খুব আশ্চার্য্য হয়ে বললেন, কি বলছেন বেয়াই সাহেব, কিছুই যে বুঝতে পারছি না?

ঃ না বোঝার কি আছে? যারা খেসী করতে এসে আমাদেরকে বিশ্বাস করে না, তাদের বাড়ীতে মেয়ে দেব না।

ইয়াসিন সাহেবের প্রতিবেশী মাহফুজ সাহেব তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, কথাটা চিন্তা করে বলেছেন?

ঃ চিন্তা না করে আমি কোন দিন কোন কথা বা কাজ বলি না বা করি না।

পাত্রের বাবা আনসার সাহেব আপমান বোধ করে খুব রাগের সঙ্গে বললেন, মেয়ের বাবার মুখে একথা শোভা পায় না। এখন ও সময় আছে, কথাটা ফিরিয়ে নিন।

ঃ না, যাদের মন এত নিচু, তাদের সঙ্গে সম্বন্ধ করবো না, এটাই আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

এমন সময় একজন বয়স্ক চাকর এসে ইয়াসিন সাহেবকে বলল, একটা ছেলে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছে।

ঃ কোথা থেকে এসেছে জিজ্ঞেস করেছ?

ঃ জী করেছি, কুষ্টিয়া থেকে।

ঃ ঠিক আছে তাকে ড্রইংরুমে বসাও, আমি আসছি। তারপর পাত্র পক্ষকে বললেন, আপনারা এখন আসতে পারেন।

আনসার সাহেব ও আরমান সাহেব রাগে ও অপমানে লাল হয়ে আর কোন কথা না বলে বিয়ের মজলিসে এসে সবাইকে মেয়ের বাবার কথা বলে বর ও বরযাত্রীদের নিয়ে চলে গেলেন। বরযাত্রীদের মধ্যে অনেকে অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য গোলমাল সৃষ্টি করে মারামারি করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তা পারল না। কারণ এই রকম ঘটনা যে ঘটতে

পারে, তা ইয়াসিন সাহেব অনুমান করেছিলেন। সেই জন্যে আগে থেকে মহল্লার কয়েকজন পাণ্ডা ধরনের ছেলেদের মজলিসে থাকার ব্যবস্থা ও করেছিলেন। বরযাত্রীরা তাদের সঙ্গে পেরে উঠতে না পেরে বর নিয়ে চলে গেছে।

মহাল্লার লোকজনদের বিদায় করে ইয়াসিন সাহেব ড্রইংরুমে এসে ঢুকলেন।

ছেলেটা দাঁড়িয়ে সালাম দিল।

ইয়াসিন সাহেব সালামের উত্তর দিয়ে ছেলেটার আপাদমস্তক লক্ষ্য করলেন, তেইশ চব্বিশ বছরের সুন্দর স্বাস্থ্যবান ছেলেটাকে চিন্তে না পেরে বললেন, তোমাকে তো চিন্তে পারছি না, দাঁড়লে কেন বস।

ছেলেটা একটা বড় খাম উনার হাতে দিয়ে বলল, আব্বা আপনাকে দেবার জন্য পাঠিয়েছেন। এগুলো আপনার খুব দরকারী কাগজ পত্র।

ইয়াসিন সাহেব খাম থেকে কাগজ পত্র বের করে দেখে বললেন, হ্যাঁ দরকারী, তারপর বেশ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তাহলে রেদওয়ানের ছেলে?

ঃ জী।

ঃ তোমার আব্বা আম্মা ভাল আছেন?

ঃ জী, আল্লাহ পাকের রহমতে ভাল আছেন। তবে আব্বা প্রায় এক বছর হল বিছানায় পড়ে আছেন। ইঠাৎ স্ট্রোক হয়ে পুরো বাম সাইডটা অবশ হয়ে গেছে।

ঃ তাই নাকি? ডাক্তার কি বলছে?

ঃ ডাক্তার বলেছেন একেবারে নরমাল না হলেও কিছুটা ভাল হবে। তবে সময় লাগবে।

ঃ তোমার নাম কি?

ঃ শাকীল আহম্মদ।

ঃ তুমি এখন কি করছ?

ঃ গ্রামের স্কুলে মাস্টারী করছি।

ঃ লেখাপড়া কতদূর করেছ?

ঃ বি,এ, পাশ করেছি।

ঃ আমি যখন আমার আম্মাকে আনতে দেশে গিয়েছিলাম তখন তোমাকে খুব ছোট দেখেছিলাম, তাই চিনতে পারি নি। আচ্ছা তোমার আব্বা কি আমার কথা তোমাকে কিছু বলেছে?

ঃ বেশী তেমন কিছু বলেননি। তবে মাঝে মাঝে যখন আব্বা চুপচাপ বসে চিন্তা করেন তখন জিজ্ঞেস করলে বলেন, কি আর চিন্তা করবো বাবা, আমার বন্ধুর কথা ভাবছি। সে এখন ঢাকার একজন বিরাট বড় ব্যবসায়ী। অনেক দিন তাকে দেখিনি। দেখতে খুব ইচ্ছা করে। আমি তখন বলি, চলুন না আপনাকে উনার কাছে নিয়ে যাই। আব্বা বলেন, না আমি যাব না। সে যদি আমাকে না দেখে থাকতে পারে, তাহলে আমি পারব না কেন?

ইয়াসিন সাহেব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তোমার আব্বা ঠিক কথা বলেছে। আমার একটা ভুলের জন্য তোমার আব্বা মনে খুব দুঃখ পেয়েছে। তোমার আব্বা আর আমি যে কি রকম বন্ধু ছিলাম, তা সময় মত তোমাকে একদিন বলবো। তুমি কি বিয়ে করেছ?

ঃ লজ্জা পেয়ে শাকীল মাথা নিচু করে বলল, জী না।

ঃ আমার মেয়ের আজ বিয়ে হতে যাচ্ছিল। পাত্র পক্ষের ব্যবহারে তাদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছি। তা বোধ হয় তুমি বুঝতে পেরেছ। এখন আমি তোমার সঙ্গে তার বিয়ে দিতে চাই। এ ব্যাপারে তুমি কি কিছু বলবে?

শাকীল নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না, মাথা নিচু করে চিন্তা করতে লাগল, যে নাকি একটা গ্রাম্য স্কুলের সামান্য মাস্টার, তাকে কিনা শহরের এক বিরাট ধনী ব্যবসায়ী তাঁর একমাত্র মেয়ের জন্য বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছেন। কথাটা চিন্তা করে সে ঘামতে শুরু করল।

ইয়াসিন সাহেব তাকে মাথা নিচু করে ভাবতে দেখে বললেন, কিছু বলছ না কেন?

শাকীল মাথা তুলে উনার মুখের দিকে একবার চেয়ে দৃষ্টি নামিয়ে নিয়ে বলল, বেয়াদবি মাফ করবেন, এ ব্যাপারে আব্বা-আম্মা যা করবেন তাই হবে। এখন আমাকে যাবার অনুমতি দিন।

ইয়াসিন সাহেব আবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তুমি ঠিক কথা বলেছ। আমারই সে কথা ভাবা উচিৎ ছিল। কিন্তু এত রাতে কোথায় যাবে? এখানেই থাক!

ঃ আমি এক আত্মিয়ের বাসায় উঠেছি, না গেলে ওরা খুব চিন্তা করবে।

ঃ তা হলে খেয়ে দেয়ে তারপর না হয় যেও।

ইয়াসিন সাহেব মেহেরপুরের চৌধুরী স্টেটের মালিকের বংশধর। উনার দাদা গাফফার চৌধুরী জমিদার না হলে ও জমিদারের মত তাঁর সব কিছু ছিল। মেহেরপুরের আশ পাশের কয়েকটি গ্রামে উনার প্রচুর জমি-জায়গা, আগান-বাগান এবং তিন চারটে জল মহল ছিল। এখন অত কিছু না থাকলেও যা আছে তা কম না। মালিকের উদাসীনতার সুযোগে কর্মচারীরা নিজেদের আখের গুছিয়ে চলেছে। তাই বর্তমানে যিনি মালিক, তিনি দাদার আমলের ঠাট বজায় রাখলে ও চৌধুরী স্টেটের সেই ঐতিহ্য আর নেই। গাফফার চৌধুরীর দুই ছেলে। বড় ছেলের নাম আঃবাসেত। আর ছোটর নাম আঃ আলিম। আঃ বাসিত কিছুটা উচ্ছৃঙ্খল হলেও আঃ আলিম বেশ ধার্মীক। আঃ বাসিতের এক ছেলে। নাম মেসবাহ উদ্দিন। আঃ আলিমের এক ছেলে এক মেয়ে। ছেলের নাম ইয়াসিন আর মেয়ের নাম জেবুন্নেশা। জেবুন্নেশা খুব সুন্দরী ছিলেন। কিন্তু বোবা। মেসবাহ উদ্দিন ও ইয়াসিন দু চাচাতো ভাইয়ের মধ্যে বেশ সখ্যতা ছিল। ইয়াসিনের আব্বা আঃ আলিম গাফফার চৌধুরী বেঁচে থাকতে মারা যান। ইয়াসিন ও মেসবাহ উদ্দিন তখন ইন্টারে পড়ে। মেসবাহ উদ্দিন আই, এ, পাশ করে পড়াশুনা বন্ধ করে দেন। সেই সময় প্রথম যৌবনের তাড়ানায় ও শয়তানের প্ররোচনায় মেসবাহ উদ্দিন চাচাতো বোন জেবুন্নেশার সাথে অবৈধ মেলামেশা করে। ফলে জেবুন্নেশা গর্ভবতী হয়ে পড়েন। আঃ আলিমের স্ত্রী ফারজানা বেগম জানতে পেরে ভাসুর আঃ বাসিতকে ঘটনাটা জানিয়ে তাদের বিয়ে দিয়ে দেবার কথা বলেন। কিন্তু উনি ও উনার ছেলে মেসবাহ উদ্দিন কেউই রাজী হলেন না। বরং এই ব্যাপার নিয়ে আঃবাসিত ছোট ভাইয়ের স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া ঝাঁটি করেন। আঃ আলিম মারা যাবার তিন মাস পর গাফফার চৌধুরী ও মারা যান। তাই জেবুন্নেশার বিয়ের কথা বলতে এলে আঃবাসেত রাগারাগি করতে করতে এক সময় বললেন, আঃ আলিম আব্বা বেঁচে থাকাতে মারা গেছেন, তুমি বা তোমার ছেলে এই সম্পত্তি থেকে কিছুই পাবে না। দয়া করে যে থাকতে ও খেতে পরতে দিচ্ছি, সেটাই যথেষ্ট।

সেখানে ইয়াসিন ছিলেন, তিনি আম্মাকে ঘরের ভিতর নিয়ে এসে বললেন, এ ব্যাপারে তুমি আর চাচার সঙ্গে কথা কাটা কাটি করো না। জেবুন্নেশার তকদীরে যা আছে হবে।

ভাসুরের কথা শুনে ফারজানা বেগম নির্বাক হয়ে গিয়েছিলেন। ছেলের কথা শুনে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বললেন, না বাবা আর কোন ব্যাপারেই কিছু বলবো না।

জেবুন্নেশা বোবা কালা হলে ও সব কিছু বুঝতে পারলেন। সেই রাত্রেই গলায় সাড়ী পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেন।

এই ঘটনায় ফারজানা বেগম ও ইয়াসিন প্রচন্ড দুঃখ পান। বছর দুই পর আব্দুল বাসিত মারা যান। বাবা মারা যাবার পর মেসবা উদ্দিন আরো বেশী উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়েন। ইয়াসিন তাকে অনেক বোঝান। কিন্তু কোন কাজ হয় নাই। আরো কিছু দিন পর মেসবাহ উদ্দুনকে মদ ও মেয়ে মানুষ নিয়ে মেতে উঠতে দেখে ইয়াসিন খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন। একদিন চাচি আম্মা জাহানারা বেগমকে কথাটা জানালেন।

জাহানারা বেগম দেওরের ছেলেকে খুব ভালবাসতেন। তাকে ধার্মিক দেখে তিনি আল্লাহ পাকের কাছে ছেলের হেদায়েতের জন্য কেঁদে কেঁদে দোওয়া চাইতেন। এখন তার কথা শুনে বললেন, আমি ওকে অনেক বুঝিয়েছি। আমার কথায় কান দেয় না। তোর সঙ্গে তো আগে খুব ভাবছিল। তুই ওকে বোঝাবার চেষ্টা কর।

চাচি আম্মার কথায় ইয়াসিন সেদিন তাকে কোরান হাদিসের কথা বলে বোঝাতে গেলে মেসবাহ উদ্দিন রেগে গিয়ে তার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেন। এমন কি বলেন, আমি যা ইচ্ছা তাই করবো, তুই বলার কে? তোর আব্বার টাকায়তো করছি না। তোর আব্বার যেমন এই সম্পত্তিতে কোন হক ছিল না, তেমনি তোর ও নেই। বেশী বাড়াবাড়ি করলে এবাড়ী থেকে বের করে দেব। এই কথা শুনে ইয়াসিন চোখের পানি ফেলতে ফেলতে মায়ের কাছে এসে মেসবাহ উদ্দিনের কথাগুলো বলে বললেন, আমরা আর এ বাড়ীতে থাকব না। আজই যেখানে মন চায় সেখানে চলে যাব।

ফারজানা বেগমের চোখেও পানি এসে গেল। বললেন, তাই চল বাবা আমারও আর এখানে টিকতে মন করে না।

ইয়াসিন তখন বি,এ, পরীক্ষা দিয়েছেন। মেহেরপুরে তখন ভাল কলেজ ছিল না। তাই কুষ্টিয়া কলেজে হোস্টেলে থেকে মেসবা উদ্দিন ও ইয়াসিন পড়েছেন। সেই সময়ে সেখানকার রেদওয়ান নামে একটা ধার্মিক ছেলের সঙ্গে ইয়াসিনের বন্ধুত্ব হয়। দুজনে একসঙ্গে বি, এ, পরীক্ষা

দিয়েছেন। ইন্টারে পড়ার সময় থেকে উভয় উভয়কে ধার্মিক জেনে বন্ধুত্ব করেন। অনেকবার তাদের বাড়ীতে ও গেছেন। রেদওয়ানের আম্মা ফৌজিয়া খাতুন তাকে নিজের ছেলের মত দেখতেন। রেদওয়ানের আব্বা রেদওয়ানকে ছোট রেখে মারা যান। মেসবাহ উদ্দিন অন্য স্বভাবের ছিলেন বলে রেদওয়ানের সঙ্গে পরিচয় থাকলে ও তার সঙ্গে মিশতেন না।

ইয়াসিন মাকে নিয়ে চৌধুরী বাড়ী ছেড়ে চলে যাবার কথা চিন্তা করতে বন্ধু রেদওয়ানের কথা তার মনে পড়ল। মায়ের কথা শুনে বললেন, আজ হোক কাল হোক, একদিন না একদিন আমাদেরকে এবাড়ী ছাড়তেই হবে। এই বাড়ীতে ,এই সম্পত্তিতে আমাদের যখন কোন হক নেই, তখন আমি চলে যাবার জন্য মনস্থির করেছি।

ফারজানা বেগম চোখের পানি মুছে বললেন, তুই শুধু এই বাড়ী, এই বিষয় সম্পত্তির কথা বলছিস কেন? প্রত্যেক মানুষকেই তো একদিন না একদিন এই দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে চলে যেতে হচ্ছে। আমার এখান থেকে যেতে কোন অমত নেই। এক্ষুণী বললাম তো তুই যেখানে নিয়ে যাবি সেখানেই যাব। কয়েক দিন পর ইয়াসিন কুষ্টিয়ায় এসে বন্ধু রেদওয়ান ও তার আম্মাকে সব কথা জানিয়ে তাদের কাছে পরামর্শ চাইলেন।

রেদওয়ানের আম্মা ফৌজিয়া খাতুন বললেন, ঐ পাপ পূরীতে থেকে তোমাদের দরকার নেই। তোমার আম্মাকে নিয়ে তুমি আমাদের বাড়ীতে চলে এস। তুমি আমার রেদওয়ানের মত। আল্লাহ চাহে তো একটা না একটা ব্যবস্থা হবেই।

কুষ্টিয়া থেকে ফিরে এসে ইয়াসিন আম্মাকে নিয়ে রেদওয়ানদের বাড়ীতে চলে আসেন। ফারজানা বেগম আসবার সময় স্বামীর জমান অনেক টাকা পয়সা ও সোনাদানা সঙ্গে এনেছিলেন। তা থেকে রেদওয়ানদের বাড়ীর কাছে জায়গা কিনে দুটো ঘর উঠিয়ে বাস করতে থাকেন। কিছু বাগান এবং আবাদি জমি ও কেনেন। সব কিছু রেদওয়ানই ব্যবস্থা করে দেন।

এর মধ্যে রেদওয়ান গ্রামের হাইস্কুলে মাস্টারী করতে শুরু করেছেন। তিনি ইয়াসিনকে দরখাস্থ করতে বলেছিলেন। কিন্তু তিনি স্কুল মাস্টারী করতে চান নাই। ফারজানা বেগম ছেলেকে কিছু একটা করার কথা বললেন। ইয়াসিন বললেন, আমি ব্যবসা করার চিন্তা ভাবনা করেছি।

ফারজানা বেগম বললেন, বেশ তো তাই কর। টাকা যা লাগে আমি দেব। ইয়াসিন মায়ের কাছ থেকে হাজার বিশেক টাকা নিয়ে ঢাকায় এসে

ছোট খাট ব্যবসা শুরু করেন। তারপর উনার ভাগ্যগুনে ও কর্মদক্ষতায় আজ ঢাকায় একজন বড় ব্যবসায়ী। গ্রীন রোডে বিরাট ছয়তলা বাড়ী। ব্যবসায় উন্নতি করে বাড়ী গাড়ী করার আগে একবার কুষ্টিয়ায় গিয়ে মাকে নিয়ে আসেন। আর কোন দিন কুষ্টিয়া যান নাই। সেখানে যা কিছু ছিল, আসবার সময় বন্ধু রেদওয়ানকে দেখাশুনার ভার দিয়ে চলে আসেন। রেদওয়ান প্রতি বছর তার জমির ও বাগানের ফসল বিক্রি করে সব টাকা ঢাকায় তার কাছে পাঠিয়ে দেন।

রেদওয়ান তার ফুপাতো বোন সুরাইয়াকে ছোট বেলা থেকে ভালবাসতেন। যখন তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন তখন রেদওয়ানই উনাকে পরীক্ষা কেন্দ্রে নিয়ে যেতেন আসতেন। শেষ পরীক্ষার দিন ফেরার পথে রেদওয়ান তাকে ভালবাসার কথা জানালে সুরাইয়া ডিনাই করেন। তারপর বন্ধু ইয়াসিনের সঙ্গে উনার পরিচয় হবার পর উনাদের দুজনকে দুজনের দিকে এগোতে দেখে রেদওয়ান মনের কষ্ট মনে চেপে রেখে আল্লাহপাকের কাছে সাহায্য চেয়ে সবর করে নেন।

সুরাইয়াদের বাড়ী তাদের বাড়ী থেকে অল্প দূরে। কথাটা দু ফ্যামিলির মধ্যে জানা জানি হবার পর কথাবার্তা ঠিক হয়, ইয়াসিন কিছু একটা করলেই বিয়ের কাজ সম্পন্ন হবে।

কিন্তু আল্লাহ পাকের ইচ্ছা অন্য রকম। তাই ইয়াসিন ঢাকায় এসে ব্যবসায় উন্নতি হতে দেখে তিনি আরো বড় হাবার জন্যে পিছনের দিকে তাকাবার সময় পেলেন না। সুরাইয়ার কথা ও মনে রাখলেন না। একদিনের জন্যে এসে সেই যে মাকে নিয়ে ঢাকায় চলে এলেন, আজ পর্য্যন্ত আর কুষ্টিয়ায় যান নাই। বাড়ী গাড়ী করার পর ঢাকার এক বড় লোকের শিক্ষিত মেয়ে মাহমুদাকে বিয়ে করেছেন। অবশ্য ষ্ট্যাবলিষ্ট হবার পর এবং বিয়ের সময় কয়েকটা চিঠি দিয়ে রেদওয়ানকে আসতে বলেছিলেন। কিন্তু রেদওয়ান বন্ধুর ব্যবহারে খুব আঘাত পেয়ে আসেন নাই। ফারজানা বেগম ছেলের ব্যবহারে অসন্তষ্ট হয়ে প্রায় রাগারাগি করতেন।

এদিকে যখন সুরাইয়ার বয়স দিন দিন বেড়ে যেতে লাগল তখন তার আব্বা ও রেদওয়ান ইয়াসিনকে অনেকবার চিঠি দিয়ে কোন উত্তর পান নাই। শেষে সুরাইয়ার আব্বা একদিন ঢাকায় গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করেন।

ইয়াসিন তখন বলেছিলেন, আমি ষ্ট্যাবলিষ্ট না হয়ে বিয়ে করব না। আপনার মেয়ের বিয়ে অন্যত্র দেবার ব্যবস্থা করুণ।

সুরাইয়ার আব্বা ফিরে এসে মেয়ের বিয়ে দেবার জন্য পাত্র খুঁজতে লাগলেন। সুরাইয়া শুনে যেমন দুঃখ পেলেন তেমনি রেদওয়ান ও পেলেন। সুরাইয়ার আব্বা পাত্র খুঁজলে কি হবে? ইয়াসিন ও সুরাইয়ার ভালবাসার কথা এবং তাদের বিয়ের কথা গ্রামের ও আশপাশের গ্রামের অনেকে জেনে গিয়েছিল। ফলে সুরাইয়ার বিয়ে হওয়া খুব মুস্কিল হয়ে পড়ল। শেষমেস রেদওয়ানের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। রেদওয়ান সে কথা পত্রের দ্বারা বন্ধু ইয়াসিনকে জানিয়েছিলেন। তাদেরই ছেলে শাকীল। শাকীলরা দু ভাই বোন। বোনের নাম আনিসা। আনিসা ম্যাট্রিক পাশ করার পর রেদওয়ান ছেলের বন্ধু গুলজারের সঙ্গে তার বিয়ে দেন। গুলজারদের বাড়ী পাশের গ্রামে। তার বাবার অবস্থা মোটা মুটি ভাল। স্কুল লাইফ থেকে দুজনে বন্ধু। দুজন দুজনের বাড়ীতে অনেকবার গিয়েছে। গুলজারের স্বভাব চরিত্র খুব ভাল। তার আব্বা আম্মা শাকীলকে খুব ভালবাসেন। তাই যখন গুলজার বি, এ, পাশ করার পর ঢাকায় অগ্রণী ব্যাংকে চাকরি পেল তখন মনে মনে ভেবে রাখল, আনিসা ম্যাট্রিক পাশ করলে তার সাথে বোনের বিয়ে দেবে। সেকথা শাকীল আব্বাকে জানিয়ে রেখেছিল। আনিসা পরের বছর ম্যাট্রিক পাশ করার পর ছেলের বন্ধুর সঙ্গে রেদওয়ান বিয়ে দেন। রেদওয়ান নিজে যেমন ধার্মিক তেমনি ছেলে মেয়েকেও সেই ভাবে মানুষ করেছেন। গুলজার স্ত্রীকে নিয়ে ঢাকায় থাকে।

শাকীলের এম, এ, পড়ার খুব ইচ্ছা ছিল। কিন্তু রেদওয়ান হঠাৎ অসুস্থ হয়ে অনেক দিন থেকে ভুগছেন। তিনি চলাফেরা করতে পারেন না। বামদিকের এক সাইড প্যারালাইজড হয়ে গেছে। তাই শাকীলের এম, এ, পড়া হল না। চাষের ধানে টেনে টুনে তাদের ছমাস চলতো। বাকি ছমাস রেদওয়ান স্কুলের বেতনের টাকায় এবং প্রাইভেট পড়িয়ে যা পেতেন তাতে চালিয়ে নিতেন। ছেলের লেখাপড়ার পিছনে ও খরচ করতেন। অনেক দিন বিছানায় পড়ে থাকায় চাকরি চলে যায়। রেদওয়ান যেমন ধার্মিক ছিলেন তেমনি আদর্শবান শিক্ষক ছিলেন। উনার আদর্শের কথা নিজেদের গ্রাম ছাড়া ও অন্যান্য গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছিল।

শাকীল বি, এ, পাশ করে অভাবের সংসারে অনেক দিন বেকার রয়েছে জেনে স্কুল কমিটি তাকে মাস্টারি করার জন্য বলে। শাকীলের মাস্টারি করার ইচ্ছা না থাকলে ও সময়ের পরিপেক্ষীতে মাস্টারি করতে লাগল। কিছুদিন পর শাকীল আব্বার কথামত ইয়াসিন সাহেবের জমি জায়গার দলীল ও কাগজ পত্র নিয়ে ঢাকায় উনাকে দিতে এসেছিল।

শাকীল চলে যাবার পর ইয়াসিন সাহেব বন্ধু রেদওয়ানের কথা ভাবতে ভাবতে চাচাতো ভাই মেসবাহ উদ্দিনের কথা মনে পড়ল। সেদিন মনের কষ্টে মাকে নিয়ে চলে এলে ও পূর্ব জীবনের কথা মনে পড়লে খুব অস্থিরতা অনুভব করেন। মেসবাহ উদ্দিন ও অনেক দিন পর তার নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি লোক পরম্পরায় শুনেছিলেন, ইয়াসিন তার মাকে নিয়ে কুষ্টিয়ায় বন্ধু রেদওয়ানেদের ওখানে আছেন। সে সময় লজ্জায় সেখানে যেতে না পারলে ও পরে যখন জানতে পারলেন, ইয়াসিন ঢাকায় ব্যবসা করে সেখানে গাড়ী বাড়ী করেছেন তখন কয়েকবার তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য গিয়েছিলেন। উনি যখন যেতেন তখন ফারজানা বেগম ভাসুরের ছেলের সঙ্গে দেখাও করতেন না। বছর তিনেক হল ফারজানা বেগম মারা গেছেন। মেসবাহ উদ্দিন নিয়ে যেতে এলে ইয়াসিন সাহেবের মনে হয়েছে, আজ সে ধনী হয়েছে বলে তাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছে। বছর খানেক আগে ও একবার মেসবাহ উদ্দিন এসে যখন বললেন, তোর তবু একটা মেয়ে আছে, আমার তাও নেই। আমাদের এই বিশাল সম্প্রত্তি কে ভোগ দখল করবে? তখন ও ইয়াসিন সাহেবের মন গলে নি। বলেছিলেন, যেখান থেকে আমার মা অপমানিত হয়ে এসেছে, সেখানে আমি যেতে পারব না। মেসবাহ উদ্দিন অশ্রুতরা চোখে ফিরে গেছেন।

ইয়াসিন সাহেবের কোন পুত্র সন্তান নেই। একটা মাত্র মেয়ে। তার নাম শাকিলা। সে এবছর বাংলায় অনার্স পেয়েছে। ইয়াসিন সাহেব লাল বাগের এক ধনাঢ্য লোকের ইঞ্জিনিয়ার ছেলে নাদিমের সঙ্গে মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করেন। তার আগে পাত্রের সঙ্গে শাকিলার বার তিনেক এ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে। কেউ কাউকে অপছন্দ করেনি। মেয়ের মত নিয়েই ইয়াসিন সাহেব বিয়ের দিন ঠিক করেন। বিয়ের পাকা কথাবার্তা হবার সময় পাত্রের মামা আরমান সহেব, উনি ও একজন ব্যবসায়ী, লেনদেনের কথা তুলেছিলে। তখন ইয়াসিন সাহেব বলেছিলেন, বিয়ের সময় লেনদেনের কথা বলা ইসলামে নিষেধ। স্বেচ্ছায় সামর্থ অনুসারে যে যা দেয়, তা খুশী মনে সবাইকে মেনে নিতে হয়।

আরমান সাহেব বললেন, আমাদের ও আপনাদের সমর্থ আছে। আমরা যদি তা করি, তাতে কোন দোষ হবে বলে মনে হয় না।

ইয়াসিন সাহেব বললেন, আমাদের কি মনে হবে, তা নিয়ে ইসলামের কোন আইন তৈরী হয়নি। কুল মোখলুকাতের যিনি মালিক, একমাত্র তিনি

যা মনে করবেন বা ইচ্ছা করবেন তাই হবে। আপনারা এ ব্যাপারে আর মুখ খুলবেন না। আল্লাহ পাক আমাকে যতটা দেবার সামর্থ দিয়েছেন, ততটা দেব। তিনি বিয়েতে মেয়েকে উনার আম্মার বিশ ভরী সোনার গহণা না ভাঙ্গিয়ে শুধু পালিশ করে এনেছেন। মেয়েকে সাজাবার আগে সেগুলো পাত্র পক্ষকে দেখাবার জন্য বিয়ের মজলিসে পাঠিয়েছিলেন।

পাত্রের মামা আরমান সাহেব খুব কূটীল লোক। ভাগিনা যে এক সময় তার শ্বশুরের সবকিছু পাবে তা জেনে ও সোনাতে কতটা খাদ আছে জানার জন্য একজন স্যাকরাকে সঙ্গে করে এনে ছিলেন। আপ্যায়ন ও খাওয়া দাওয়ার পর ইয়াসিন সাহেব বিয়ে পড়াবার কথা তুললে আরমান সাহেব বললেন, তার আগে আপনি মেয়েকে যে সব সোনার গহনা দিচ্ছেন, সেগুলো আমরা পরীক্ষা করতে চাই।

ইয়াসিন সাহেব শুনে খুব রেগে গেলেন। কিন্তু বাইরে তা প্রকাশ করলেন না। গম্ভীর স্বরে বললেন, বেশ তাহলে ভিতরে চলুন।

আরমান সাহেব পাত্রের বাবাকে ও স্যাকরাকে নিয়ে ভিতরে গেলেন। ইয়াসিন সাহেব একজনকে মজলিস থেকে গহনার বাক্সগুলো নিয়ে আসতে এবং পাত্রকে ও সঙ্গে করে আনতে বললেন।

আরমান সাহেব বললেন, পাত্র আবার এখানে অসবে কেন?

ইয়াসিন সাহেব বললেন, আসলে জিনিসগুলোর মালিক তো সেই। অতএব কতটা আসল আর কতটা নকল জিনিস সে পাচ্ছে, তা নিশ্চয় তার দেখা উচিৎ? তারপর লোকটাকে বললেন, যা বললাম তাড়াতাড়ি কর। লোকটা সোনার বাক্সগুলো ও বর বেশী নাদিমকে নিয়ে ফিরে এল। ইয়াসিন সাহেব নাদিমকে বসতে বলে স্যাকরাকে বললেন, পরীক্ষা করুন।

স্যাকরা দু একটা বাক্স খুলে গহনাগুলো উল্টে পাল্টে দেখে বললেন, এগুলো দেখছি সাবেক কালের খাঁটি জিনিস। কষ্টি পাথরে ঘসে আর পরীক্ষা করা লাগবে না। কথা শেষ করে তিনি নিজেই আবার সেগুলো বাক্সে রাখার সময় বললেন, এ যুগে এরকম সোনাই পাওয়া দুষ্কর। তারপরের ঘটনা যা ঘটেছিল, তা পাঠক পাঠিকারা কাহিনীর শুরুতেই পড়েছেন।

শাকিলার বান্ধবীরা তাকে সাজাবার জন্য এসে সোনার গহনার খোঁজ করতে গিয়ে যা শুনল, তাতে তারা খুব অবাক হয়ে গেল। পাত্রপক্ষ গহনা পরীক্ষা করায় শাকীলার আব্বা তাদেরকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছেন।

বান্ধবীরা বিস্ময় কাটিয়ে উঠে ফিরে এসে শাকিলাকে জানাল। শাকিলা ধর্মশীলা মেয়ে না হলে ও ফরয নামায, ফরয রোজা করে। তবে পর্দা মেনে চলে না। বাইরে বেরোবার সময় চাদর বা বোরখা ব্যবহার করে না। শুধু একটা প্রচলিত সরু ওড়ানার দুই প্রান্ত দুই কাঁধের উপর দিয়ে পিছনে ঝুলিয়ে মাঝখানটা টেনে বুকের ওপর দেয়। আযান শুনলে ওড়নার একদিকটা নিয়ে মাথায় দেয়। পরে নামিয়ে ফেলে। কখনো কখানো একটা রুমাল দিয়ে মাথা চুলসহ বেঁধে রাখে। খুব সুন্দরী না হলে ও সুন্দরী। গায়ের রং ফর্সা ও কালোর মাঝামাঝি। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল। যে কোন ছেলের দৃষ্টি তার দিকে পড়লে ফিরেয়ে নেওয়া শক্ত। ধনী ব্যবসায়ীর একমাত্র মেয়ে হিসাবে যতটা অহংকার থাকা উচিৎ ততটা নেই। হয় তো সে অপরূপা নয় বলে, নচেৎ তার মধ্যে কিছু ধর্মীয় জ্ঞান আছে বলে। বান্ধবীদের কাছে বিয়ে ভেঙ্গে যাবার কথা শুনে শাকিলা স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইল। তারপর তার চোখ দুটো পানিতে ভরে উঠল। বান্ধবীদের কেউ কেউ তাকে প্রবোধ দিতে থাকলে শাকিলা তাদেরকে বলল, তোরা এখন যা। আমাকে একটু একলা থাকতে দে। বান্ধবীরা চলে যাবার পর সে ভাগ্যের কথা চিন্তা করে নিজেকে সামলে নিল। তারপর মায়ের রুমে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল, বাবা কোথায়?

মাহমুদা বেগম বললেন, কুষ্টিয়া থেকে কে একটা ছেলে এসেছে, তার সঙ্গে দেখা করতে ড্রইংরুমে গেছে।

শাকিলা ড্রইংরুমের দরজার কাছে এসে পর্দা ফাঁক করে দেখল, বাবা একা চুপ করে বসে আছে। ভিতরে ঢুকে বাবা বলে ডেকে তার কাছে এসে দাঁড়াল।

ইয়াসিন সাহেব এতক্ষণ আগের জীবনের কথা চিন্তা করছিলেন। মেয়ের ডাকে সম্বিত ফিরে পেয়ে তার একটা হাত ধরে পাশে বসিয়ে গায়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, আমার ওপর তোর খুব মনে কষ্ট হয়েছে, না?

শাকিলা কোন কথা বলতে পারল না। বাবার বুকে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে উঠল।

ইয়াসিন সাহেবের চোখে ও পানি এসে গেল। ভিজে গলায় বললেন, আমার ওপর তুই মনে কষ্ট করিস না। আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হয়তো অন্য

রকম, তাই এ রকম হল। তারপর তিনি হাতের উল্টোপিঠে চোখ মুছে বললেন, বাপ হয়ে তোর কাছে ক্ষমা চাইছি।

শাকিলা বাবাকে জড়িয়ে ধরে বলল, এ তুমি কি বলছ বাবা। আর কখনো এমন কথা বলবে না। তোমার ওপর আমার কোন মনে কষ্ট নেই। তুমি যা ভাল বুঝেছ করেছ। বাবাকে আবার চোখ মুছতে দেখে বলল, তুমি অত ভেঙ্গে পড়ছ কেন? আল্লাহ পাক আমার তকদ্বীরে যা রেখেছেন তা হবেই।

ইয়াসিন সাহেব বললেন, আমার কেবলই মনে হচ্ছে, তোর প্রতি অবিচার করে ফেললাম।

শাকিলা বলল, না বাবা তুমি কোন অবিচার করোনি। আল্লাহ পাকের ইচ্ছাতেই সব কিছু হয়েছে। এখন আর ওসব কথা চিন্তা করো না। মা বলল, কুষ্টিয়া থেকে কে যেন এসেছিল?

ইয়াসিন সাহেব টেবিলের ওপর থেকে খামটা নিয়ে মেয়ের হাতে দিয়ে বললেন, আমি আর তোর দাদী যখন মেহেরপুর থেকে এসে কুষ্টিয়ায় এক বন্ধুর বাসায় ছিলাম তখন সেই বন্ধু কিছু জমি জায়াগা কিনে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। সেই সব জমি জায়গার দলীল পত্র এতদিন বন্ধুর কাছেই ছিল। তারই ছেলে এসে দিয়ে গেল। জানিস মা, আব্বার ঐ বন্ধুটা যেমন ধার্মিক তেমনি আদর্শ বান শিক্ষক ছিল। তার ছেলের কাছে শুনলাম, তার বাম সাইডটা এক বছর হতে চলল অবশ হয়ে বিছানায় পড়ে আছে। সে যে আমার কি রকম বন্ধু ছিল, তা তোকে বোঝাতে পারব না।

শাকিলা বলল, এ সময় উনাকে একবার তোমার দেখতে যাওয়া উচিৎ।

ঃ যাওয়া তো একান্ত উচিৎ, কিন্তু মা যাবার রাস্তা যে আমি নিজেই বন্ধ করে দিয়েছি।

ঃ সেই রাস্তা আবার কি খোলা যায় না বাবা?

ঃ আল্লাহ পাক রাজী থাকলে সেই চেষ্টা করবো মা। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে আবার বললেন, তার ছেলেকে দেখে তাকে তার বাবার মত বলে মনে হল। ছেলেটা বি, এ, পাশ করে স্কুল মাষ্টারি করছে।

ঃ তাকে আজ এখানে থাকতে বললে না কেন?

ঃ বলেছিলাম, সে তার এক আত্মিয়ের বাসায় উঠেছে। না গেলে তারা চিন্তা করবে, তাই চলে গেল। তারপর আবার বললেন, যে সময় আমাদের

পূর্ব পুরুষদের বাড়ী ছেড়ে ওদের বাড়ীতে চলে আসি তখন তোর দাদী ও আমি আসবার সময় চোখের পানিতে বুক ভাসিয়েছিলাম। কথা শেষ করে তিনি আবার চোখ মুছলেন।

ঃ তোমাকে না সেই সব পুরানো কথা ভাবতে নিষেধ করেছি। ওসব চিন্তা আর কখনো করো না। আল্লাহ কি তোমাকে সে সবের চেয়ে কম কিছু দিয়েছেন?

ঃ না মা তা দেন নি। বরং তার চেয়ে অনেক বেশী দিয়েছেন। সে জন্য তাঁর পাক দরবারে লাখ লাখ শুকরিয়া জানাই।

ঃ আমি দাদীর কাছে তোমাদের পূর্ব পুরুষদের অনেক কথা শুনেছি। আমার কি মনে হয় জান বাবা, আল্লাহ পাকের ঈশারায় ঐ রকম ঘটনা ঘটেছিল বলে আজ তুমি এত উন্নতি করতে পেরেছ। আর তাঁরই ঈশারায় আবার আজ আমার বিয়েতে ও এই বিপর্য্যয় ঘটল। তাঁর কথা স্মরণ করে আমাদেরকে সবর করে থাকতে হবে।

ঃ তুই খুব দামী কথা বলেছিস মা। তোর কথা শুনে আমার দুঃশ্চিন্তা দূর হল। চল মা এশার নামায পড়ে আল্লাহ পাকের কাছে সাহায্য চাইব।

এমন সময় মাহমুদা বেগম এসে বললেন, বাপ মেয়েতে সারারাত গল্প করবে, না নামায পড়ে খাওয়া দাওয়া করবে?

শাকিলা বলল, তুমি যাও মা, আমরা এক্ষুণী আসছি। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বাবার একটা হাত ধরে বলল, চল।

দুই

শাকীল ইয়াসিন সাহেবের বাসা থেকে শাজহানপুরে গুলজারের বাসায় এল। গুলজার বন্ধু হয়ে ছোট বোনের স্বামী হলে ও দুজন বন্ধুর মত ব্যবহার করে। বিয়ের পর প্রথম দিকে গুলজার শাকীলকে স্ত্রীর বড় ভাই হিসাবে সম্মান দিয়ে কথা বলতো। একদিন শাকীল তাকে বলল, দেখ আমার লোকে বিয়ে করেছিস বলে আমাকে সম্মান দিয়ে কথা বলতে তোকে কে বলেছে। আমরা আগে যেমন বন্ধু ছিলাম, সেরকম চিরকাল থাকবো।

তারপর থেকে নিজের বাড়ীতে বা শ্বশুর বাড়ীতে যখন যায় তখন ছাড়া সবখানে সব সময় বন্ধুর মত ব্যবহার করে। গুলজার বিয়ের দু মাস পরে আনিসাকে নিয়ে শাজাহান পুরে বাসা ভাড়া নিয়ে আছে। স্কুল বন্ধ থাকায় বোনের বাসায় তিন চার দিন থেকে শাকীল বাড়ী ফিরতে চাইলে গুলজার বলল, পরশু দিন আবহানি ও মোহামেডানের ফাইন্যাল লীগের বল খেলা আছে, দেখে তারপর যাস। আনিসাও ভাইয়াকে থাকার জন্য বলল। শেষে বাধ্য হয়ে শাকীলকে থাকতে হল।

খেলার দিন কাউন্টারে প্রচণ্ড ভীড় দেখে শাকীল গুলজারকে বলল, দরকার নেই খেলা দেখে, ফিরে যাই চল।

গুলজার বলল, আবে তুই কি? চেহারাখানা তো খাসা, ভীড়কে ভয় করছিস কেন? কাউন্টারে টিকিট কাটতে না পেরে শেষে ব্ল্যাকে টিকিট কেটে তারা ভিতরে এসে মোহামেডানের গ্যালারীতে বসল। সবখানে বেশ কিছু মেয়ে দেখে শাকীল গুলজারকে বলল, মেয়েরা যে খেলা দেখতে এসেছে, যদি গোলমাল হয়ে মারমারি আরম্ভ হয়, তা হলে মেয়েদের অবস্থা কি হবে তা কি ওরা ভেবে দেখে নি?

গুলজার বলল, সে কথা ভাবলে কি আর খেলা দেখতে আসত?

আধ ঘন্টা খেলা হবার পর মোহমাডান আবহানিকে একটা গোল দিল। সেই গোলটা নিয়ে গোলমাল শুরু হল। রেফারী অফসাইড দেখিয়ে গোলটা নাকচ করে দিয়েছে। মোহামেডানের সাপোটাররা রেফারীর উপর ক্ষেপে আগুন। তারা বলতে লাগল, শালা কুত্তার বাচ্চা রেফারী, আবহানির কাছ থেকে ঘুষ খেয়ে গোলটা নাকচ করে দিল। এক সময় তারা গ্যালারী থেকে নেমে রেফারীকে মারবার জন্য মাঠে ঢুকে পড়তে আবহানির গ্যালারী থেকে তাদের সাপোর্টারয়ার ও মাঠে ঢুকে তাদের সঙ্গে মারামারী আরম্ভ করে দিল। পুলিশরা বাধা দিয়ে কিছু করতে না পেরে কাঁদুনে গ্যাস ছাড়তে শুরু করল। উভয় দলের সাপোটারা তখন পুলিশের উপর চড়াও হল। দর্শকদের মধ্যে থেকে কয়েকটা বোমা ফাটাতে সমস্ত দর্শকরা বন্যার পানির স্রোতের মত গ্যালারী থেকে নেমে পালাতে লাগল। কে কার আগে নামবে সেই চেষ্টাতে ভীষন ধাক্কা ধাক্কী হয়ে কে কোথায় ছিটকে পড়ছে তার হিসাব নেই। শাকীলের মনে হল, যেন যুদ্ধ লেগে গেছে।

গুলজার শাকীলের একটা হাত ধরে টানতে টানতে নামছিল। শাকীল পা ফসকে একটা মেয়ের সঙ্গে ধাক্কা খেল।

মেয়েটা শাকীলকে দুহাতে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে বলল, ননসেন্স, অভদ্র, ইতর কোথাকার। মেয়েছেলে দেখলেই গায়ে হাত দিতে ইচ্ছা করে না? যত সব ছোটলোক... কথাটা সে আর শেষ করতে পারল না। ভীড়ের ধাক্কায় তার তখন চিড়ে চ্যাপ্টা হবার উপক্রম।

ভীড়ের চাপে গুলজার ও শাকীলের কাছ থেকে কোথায় চলে গেছে। শাকীল গালাগালি শুনেও মেয়েটার দিকে তাকিয়ে তার মনে করুনার উদ্রেক হল। মেয়েটা ভীড়ের মধ্যে পড়ে হিমশিম খাচ্ছে। ভয়ে তার মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেছে। শাকীল তাড়াতাড়ি ভীড় ঠেলে এগিয়ে এসে মেয়েটাকে আগলে রেখে বলল, আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

শাকিলা এক পলক শাকীলের দিকে চেয়ে বেশ অবাক হয়ে চিন্তা করল, যাকে ঐ ভাবে অপমান করলাম, সে কিনা.....ভীড়ের ধাক্কায় শাকিলার চিন্তা ছুটে গেল। সে তখন কিছুটা দূরে সরে গেছে।

শাকীল এগিয়ে গিয়ে তার একটা হাত ধরে একপাশে সাইড নিয়ে বলল, ভীড়টা একটু কমুক , নচেৎ ভীড়ের মধ্যে বার হওয়া খুব কষ্টকর হবে। কিছুক্ষনের মধ্যে পুলিশরা অনেকটা সামাল দিয়েছে।

ভীড় কমার পর শাকীল বলল, এবার চলুন যাওয়া যাক। স্টেডিয়ামের বাইরে এসে শাকিলা মাথা নিচু করে বলল, ভুল বুঝে আপনার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করে ফেললাম। সে জন্যে ক্ষমা চাইছি। শাকীল বলল, ঐ রকম অবস্থায় কারোই হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। আমি যেমন আপনাকে অনিচ্ছাকৃত ধাক্কা দিয়েছি, তেমনি আপনিও আমাকে ঐ রকম বলেছেন। এরকম পরিস্থিতিতে এটাই স্বাভাবিক। আমি কিছু মনে করিনি।

ঃ তা হোক তবু আপনি বলুন ক্ষমা করেছেন?

ঃ তা হলে তো আমাকেই প্রথমে ক্ষমা চাইতে হয়। অন্যায় আগে আমি করেছি।

ওরা হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছিল। একটা রেস্টুরেন্ট দেখতে পেয়ে শাকীল বলল, চলুন একটু গলা ভেজান যাক।

শাকিলা না করতে পারল না। কারণ একটু আগে যা ঘটনা ঘটে গেল, তাতে তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। কিছু না বলে তার সাথে রেস্টুরেন্টে এসে চুপ করে বসে রইল। তখন ও তার মন থেকে স্টেডিয়ামের ভিতরের ঘটনাটা যাচ্ছে না। ভাবল, ছেলেটা ওরকমভাবে অপমানিত হয়ে ও আমার বিপদ দেখে সাহায্য করতে এগিয়ে এল।

শাকীল বেয়ারাকে কেক ও ফান্টার অর্ডার দিল। শাকিলাকে চুপ করে থাকতে দেখে বলল, কি ব্যাপার কিছু বলছেন না যে?

শাকিলা বলল, আগে বলুন ক্ষমা করেছেন।

শাকীল স্মীত হাস্যে বলল, আপনি এখানো সে কথা ভাবছেন? বললাম না, ঘটনাটা যাই ঘটুকনা কেন, দুজনেরই আনিচ্ছাকৃত অবস্থায় ঘটেছে। সে কথা ভেবে মন খারাপ করছেন কেন? কয়েক সেকেণ্ড বিরতি দিয়ে তার চোখের দিকে চেয়ে বলল, আমার মনে হয়, আমরা দুজন দুজনকে ক্ষমা করেছি।

শাকিলা শাকীলের মুখের দিকে চেয়েছিল। ফলে দুজনের চোখে চোখ পড়ল। কয়েক মুহূর্ত কিছু বলতে পারল না।

শাকীল বলল, আমি কি ঠিক বলিনি?

শাকিলা দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে বলল, হ্যাঁ ঠিক বলেছেন।

এমন সময় বেয়ারা আর্ডার মত সব কিছু দিয়ে চলে গেলে শাকীল বলল, নিন শুরু করুণ। তারপর একপীস কেক খেয়ে ফান্টার পাইপে একটা টানদিয়ে বলল, অভদ্রতা হলে ও আপনপর নামটা জানতে ইচ্ছে করছে।

শাকিলার মুখে তখন কেক। সেটা গলধঃকরণ করে বলল, অভদ্রতা হবে কেন? আমার নাম শাকিলা।

শাকীল মৃদু হেসে উঠল।

ঃ নাম শুনে হাসলেন যে?

ঃ হাসি পেল তাই হাসলাম।

ঃ হাসির পেছনে কোন কারণ থাকে। ঐ নামে নিশ্চয় আপনার কোন আপনজন আছে?

ঃ না নেই। তবে----- বলে থেমে গেল।

ঃ কি হল থামলেন কেন?

ঃ শুনলে আপনি মাইণ্ড করবেন।

ঃ মাইণ্ড কারার কি আছে; আপনি বলুন।

ঃ আমার নাম শাকীল।

নাম শুনে শাকিলা বেশ অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকাতে দেখল, সে ও তার দিকে চেয়ে আছে। কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলতে

পারল না। শাকিলার মনে হল, শাকীলের চোখের দৃষ্টি তাকে যেন অনেক কিছু বলতে চায়। দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে হাসি মুখে বলল, তাই?

ঃ হ্যাঁ তাই। আপনি একা এসেছেন?

ঃ সঙ্গে ড্রাইভার ও এক বান্ধবী ছিল। ভীড়ের মধ্যে তাদেরকে হারিয়ে ফেলেছি। তারা হয়তো এতক্ষণ আমাকে খুঁজে না পেয়ে গাড়ীর কাছে অপেক্ষা করছে।

ঃ তা হলে তো আর দেরী করে বেচারীদেরকে চিন্তায় রাখা ঠিক হচ্ছে না। চলুন ওঠা যাক।

রেষ্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে শাকিলা বলল, আমাদের বাসায় চলুন না, বাবার সঙ্গে পরিচয় করবেন।

ঃ আমিও আমার বন্ধুর সঙ্গে খেলা দেখতে এসেছিলাম। ভীড়ের মধ্যে তাকে হারিয়েছি। সে হয়তো এতক্ষণ ধরে আমাকে খোঁজাখুজি করছে।

শাকিলা ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে কাগজ কলম নিয়ে ঠিকানা লিখে শাকীলের হাতে দেবার সময় বলল, তা হলে সময় করে একদিন আসবেন।

শাকীল ঠিকানাটা না দেখে পকেটে রাখতে রাখতে বলল, তাও বোধ হয় সম্ভব হবে না।

ঃ কেন?

ঃ কাল বাড়ী চলে যাব।

ঃ বাড়ী কোথায়?

ঃ কুষ্টিয়ায়।

ঃ আমার বাবা ও অনেকদিন কুষ্ঠিয়ায় ছিলেন। কুষ্ঠিয়ায় কোথায় আপনাদের বাড়ী?

ঃ শহরতলীতে

এবার কি বলবে ঠিক করতে না পেরে শাকিলা চুপ করে রইল।

শাকীল তা বুঝতে পেরে বলল, ঠিকানা তো রইল, আল্লাহ পাক রাজী থাকলে আবার যখন আসব তখন যাবার চেষ্টা করবো। এখন আসি, আল্লাহ হাফেজ বলে সে গুলজারকে খুঁজতে চলে গেল।

শাকিলা ও অস্ফুট স্বরে আল্লাহ হাফেজ বলে তার দিকে চেয়ে রইল। তারপর তাকে দেখতে না পেয়ে গাড়ীর দিকে এগোল।

গাড়ীর কাছে এলে বান্ধবী চৈতী বলল, কিরে, এতক্ষণ কোথায় ছিলি? এদিকে আমরা তোকে খুঁজে না পেয়ে চিন্তা করছি।

শাকিলা ব্যাপারটা চেপে গিয়ে বলল, আমি তোদেরকে খুঁজে না পেয়ে একটু গলা ভিজিয়ে এলাম।

সেদিন বাসায় এসে শাকিলার মনে শুধু একটা কথা মনে পড়তে লাগল, ছেলেটাকে ঐভাবে অপমান করলাম, তারপর ও সে আমাকে সাহয্য করতে এগিয়ে এল। ছেলেটা নিশ্চয় অন্য দশটা ছেলের মত নয়। তার নাম শাকীল মনে হতে শাকিলার মনের মধ্যে এক রকমের আনন্দের স্রোত বইতে লাগল। ভাবল, ছেলেটা আবার ঢাকায় এলে আমাদের বাসায় কি আসবে? বাড়ী বলল কুষ্টিয়ার শহরতলীতে। ঠিকানা নিলে ভাল হত। কিন্তু সেটা চাওয়া কি উচিৎ হতো?

শাকীল গুলজারকে খুঁজে না পেয়ে বাসায় ফিরে এসে মেয়েটার ঠিকানা পড়ে চমকে উঠল। শাকিলা তাহালে আব্বার বন্ধুর মেয়ে। ঐ দিন ওরই বিয়ে ভেঙ্গে যেতে আমার সঙ্গে বিয়ে দিতে আব্বার বন্ধু চেয়েছিলেন। পরের দিন শাকীল বাড়ী ফিরে এসে আব্বা আম্মাকে আনিসা ও গুলজার ভাল আছে জানাল। তারপর আব্বাকে বলল, আপনার বন্ধুর দলীল পত্র এখান থেকে যেদিন গেলাম, ঐ দিনই উনার হাতে দিয়েছি।

রেদওয়ান জিজ্ঞেস করলেন, ওরা কেমন আছে।

শাকীল বলল, উনারা ভাল আছেন। তারপর শকিলার বিয়ে ভেঙ্গে যাবার কথা বলে ইয়াসিন সাহেবের বিয়ের প্রস্তাব দেবার কথা বলল।

সুরাইয়া খাতুন সেখানে ছিলেন। শুনে তার পূরান কথা মনে পর্দায় ভেসে উঠল। স্বামী কিছু বলার আগে খুব রেগে গিয়ে গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, তুই তখন কি বললি?

শাকীল মায়ের রেগে যাবার কারণ বুঝতে পারল না। ভয়ে ভয়ে বলল, তোমাদের মতের উপর নির্ভর করছে বলে কাটিয়ে দিয়েছি।

সুরাইয়া খাতুন ছেলের মাথায় চুমো খেয়ে বললেন, এটাই আমি আশা করেছিলাম। একটা কথা মনে রাখবি, বড় লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা গেলে ও তাদের সঙ্গে আত্মিয়তা করা যায় না। তারপর একটা খাম ছেলের হাতে দিয়ে বললেন, গত পরশু এসেছে।

স্কুলে মাস্টারী করে আর্থিক উন্নতি করতে পারবে না ভেবে শাকীল প্রতিদিন খবরের কাগজে কর্মখালি বিজ্ঞাপন দেখে। পছন্দমত কিছু পেলে

দরখাস্ত পাঠায়। সব জায়গা থেকে না হলেও কোন কোন জায়গা থেকে ইন্টারভিউ লেটার পায়। সে সব জায়গায় ইন্টারভিউ ও দিয়েছে। কিন্তু কোন ফল হয় নি। দিন পনের আগে মেহেরপুর চৌধুরী স্টেটে ম্যানেজার পদের জন্য একজন লোকের দরকার দেখে দরখাস্ত করেছিল। মায়ের হাত থেকে খামটা নিয়ে ঠিকানা পড়ে বুঝতে পারল, সেখান থেকে এসেছে। তারপর খাম থেকে চিঠিটা বের করে পড়ে বলল, কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে মেহেরপুর চৌধুরী স্টেটের ম্যানেজার পদের জন্য দরখাস্ত করেছিলাম। ইন্টারভিউ দিতে ডেকেছে।

ছেলের কথা শুনে রেদওয়ান এখন ও কিছু বললেন না। শুধু উনার কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠল।

সুরাইয়া খাতুন স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে তা বুঝতে পেরে ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, মাস্টারীর চেয়ে ওটা কি ভাল হবে?

ঃ আগে ইন্টারভিউ দিয়ে এলাউ হই। তারপর সব কিছু দেখে শুনে যদি ভাল মনে করি, তা হলে করবো, নচেৎ মাস্টারীই করবো।

ঃ ইন্টারভিউ এর তারিখ কবে?

ঃ আগামী কাল। আব্বা কিছু বলছে না দেখে জিজ্ঞেস করল, আপনি কিছু বলছেন না কেন?

রেদওয়ান একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, কি আর বলবো বাবা, তুমি যা ভাল বুঝ করবে। শাকীল বড় হবার পর থেকে রেদওয়ান তার সঙ্গে তুমি সম্বোধনে কথা বলেন। আর শাকীল ছোটবেলা থেকে আব্বাকে আপনি করে বলে।

নির্দিষ্ট দিনে শাকীল আব্বা আম্মাকে কদমবুসি করে দাদীকে ও করতে গেলে ফৌজিয়া খাতুন নাতির মাথায় চুমো খেয়ে দোয়া করলেন, ''আল্লাহ তোকে সাহিসালামতে রাখুক, তোর মনস্কামনা পুরণ করুক।''

শাকীল বাসে করে যেখানে নামল, সেখান থেকে আরো তিন মাইল হেঁটে অথবা রিক্সা করে যেতে হবে। রিক্সা ভাড়া পনের টাকা শুনে হাঁটতে শুরু করল। শাকীল ছোটবেলা থেকে সংসারের সব কাজ কর্ম করে। নিজেদের যতটুকু ক্ষেত খামার আছে, সেগুলোতে নিজেই চাষাবাদ করে। খুব দরকার মনে করলে দু একজন কামলা সঙ্গে নেয়। এখন সে মাষ্টারী করলে ও সে সব কাজ ও করে। খুব হিসাবী ছেলে। তার আব্বার মতো

মিতব্যায়ী। মাত্র তিন মাইলের জন্য পনের টাকা ভাড়া দিতে তার মন চাইল না। তাই সে হেঁটে চলল।

গ্রামের কাছাকাছি এসে দুর থেকে বিরাট অট্টালিকা দেখে বুঝতে পারল, এটাই চৌধুরী বাড়ী। শাকীল দাদীর কাছে চৌধুরী বাড়ীর অনেক সুনাম দুর্নাম শুনেছে। এ বাড়ীর অনেক আশ্চার্য্য আশ্চার্য্য গল্প ও শুনেছে। আজ সেই চৌধুরী বাড়ীতে চাকরি করার জন্য ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছে। হঠাৎ তার আব্বার কথা মনে পড়ল, -- কিভাবে আব্বার বন্ধু ইয়াসিন সাহেব চৌধুরী বংশের ছেলে হয়েও ঐ সম্পতি থেকে নামোহরুম হলেন এবং কেন তিনি ঐ বাড়ী থেকে উনার মাকে নিয়ে আমাদের এখানে চলে এসেছিলেন। তারপর কিভাবে ব্যবসা করে বড়লোক হলেন, সব কথা একের পর এক তার মনের পাতায় ভেসে উঠতে লাগল। কাছে এসে গেট দেখে সে খুব অবাক হয়ে গেল। পাচ টনি ট্রাক অনায়াসে যেতে পারবে। গেটের পাশে একজন আধা বয়সী ইয়া গোঁফ ওয়ালা লম্বা চওড়া লোক টুলে বসে আছে। তার পাশে পাঁচ হাতি একটা তেল চিকচিকে বাঁশের লাঠি গেটের দরজায় ঠেক দেওয়া রয়েছে। শাকীল এগিয়ে এসে তাকে সালাম দিল।

বর্তমানে এই ষ্টেটের যিনি মালিক তাঁর নাম মেসবাহউদ্দিন চৌধুরী। দাদা গাফফার চৌধুরী একবার আগ্রার তাজ মহল দেখতে এবং আজমীর শরীফে হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী (রঃ) এর মাজার জিয়ারত করতে গিয়েছিলেন। ফেরার পথে দিল্লী ও পাটনাতে কয়েক দিন অবস্থান করেন। সেই সময় পাটনা থেকে দারুয়ানী করার জন্য একজনকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। তারই নাতি ফুল মিয়া। ফুলমিয়ার বাবা ও দারুয়ানী করেছে। তার মৃত্যুর পর ফুল মিয়া আজ পনের বছর যাবৎ দারুয়ানী করছে। এর মধ্যে কোন ভদ্রলোক তাকে সালাম দেয়নি। বরং সেই সবাইকে দিয়ে এসেছে। আজ একজন খুবসুরত জোওয়ান ভ্রদলোককে সালাম দিতে দেখে খুব অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে সালামের জবাব দিয়ে বলল, কি জন্য এসেছেন বাবু?

শাকীল বলল, এখানকার মালিক ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য আমাকে চিঠি দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছেন।

ফুল মিয়া বলল, যান বাবু সোজা ভিতরে চলে যান। সামনে কাচারি বাড়ীর অফিস । ওখানে সাহেবের লোক আছে।

শাকীল ভিতরে ঢুকে আরো অবাক হল। পাঁচিলের ভিতর বিরাট এলাকা। নানারকম ফলের গাছ। এক সাইডে পাঁচিলের গা ঘেঁসে বেশ কয়েকটা পাকা রুম। গেট থেকে কাচারি পর্য্যন্ত রাস্তার দুপাশে কয়েক রকম পাতা বাহার ফুলের গাছ। রাজবাড়ীর মত বাড়ীটা ঠিক মাঝখানে। পশ্চিম দিকে বেশ বড় একটা পুকুর। পুকুরের তিন দিকের পাড়ে অনেক গাছ পালা। পূর্ব দিকে সান বাঁধান ঘাট। বাড়ীটার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল, বহুকাল আগের বাড়ী। সংস্কারের অভাবে আগের সৌন্দর্য্য হারিয়ে গেছে। শাকিলের মনে হল, বাড়ীটার পিছনের দিকে ও অনেক জায়গা আছে। সে এই সব দেখতে দেখতে যখন কাচারি বাড়ীর বারান্দায় উঠল তখন একজন লোক এগিয়ে এসে সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি ইন্টারভিউ দিতে এসেছেন?

শাকীল সালামের উত্তর দিয়ে বলল, জী।

লোকটা তাকে সঙ্গে করে একটা রুমে ঢুকে বলল, এখানে বসুন। সময় মত আমি ডেকে নিয়ে যাব। তারপর লোকটা পাশের রুমের চলে গেল। শাকীল রুমে তারমত আট দশ জন ছেলেকে বসে থাকতে দেখে সালাম জানিয়ে বলল, আপনারাও কি ইন্টারভিউ দিতে এসেছেন।

তাদের মধ্যে কয়েকজন সালামের জবাব দোবার পর একজন বলল, হ্যাঁ ভাই, ঠিকই অনুমান করেছেন। তাদের সঙ্গে আলাপ করে শাকীল জানতে পারল, ঢাকা থেকে ও দুজন এসেছেন। কিছুক্ষণ পর পর সেই লোকটা এসে এক একজনকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে। দশ পণের মিনিট পর তাকে সঙ্গে করে এনে অন্য জনকে নিয়ে যাচ্ছে। সব শেষে শাকীলের ডাক পড়ল।

শাকীল ঢুকেই সালাম দিয়ে সকলের দিকে একবার চোখ বুলোতে গিয়ে একজন প্রৌঢ় সুন্দর ও স্বাস্থ্যবান লোকের দিকে চেয়ে অনুমান করল, ইনিই চৌধুরী ষ্টেটের মালিক। আরো যারা তিন চারজন রয়েছেন, তাদের সঙ্গে উনার বেশ কিছু তফাৎ লক্ষ্য করল।

মেসবাহ উদ্দিন চৌধুরী এতক্ষণ অন্যান্য ছেলেদের ইন্টারভিউ এর সময় শুধু এক পলক তাদের দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে চুপ করে ছিলেন, যা জিজ্ঞেস করার অন্যান্য লোক যারা রয়েছেন, তারা করেছেন। তিনি কাউকে কিছু প্রশ্ন ও করেননি। তাই দেখে কর্মচারীরা বুঝেছেন, তাদের কাউকে মালিকের পছন্দ হয়নি। এই ছেলেটার দিকে চৌধুরী সাহেবকে চেয়ে থাকতে দেখে নায়েব জমিরুদ্দিন সালামের উত্তর দিয়ে

বললেন, দাঁড়িয়ে আছেন কেন বসুন। শাকীল দৃষ্টি সরিয়ে উনার পাশে দাঁড়ান একজন চল্লিশার্ধ দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ চেহারার লোকের দিকে একবার চেয়ে নিয়ে একটা চেয়ারে বসল। মেসবাহ উদ্দিন চৌধুরীর তখনও শাকীলের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। বসার পর জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম?

ঃ শাকীল আহম্মদ।

ঃ বাড়ী?

ঃ কুষ্টিয়া।

ঃ বাবার নাম?

ঃ রেদওয়ান আহম্মদ।

ঃ লেখাপড়া?

ঃ বি, এ,।

মেসবাহ উদ্দিন চৌধুরী নায়েবের দিকে তাকিয়ে বললেন, আর কেউ বাকি আছে?

ঃ জী না।

মেসবাহ উদ্দিন চৌধুরী আর কিছু না বলে ভিতর বাড়ীতে চলে গেলেন। নায়েব জমিরুদ্দিনের বয়স পঞ্চাশের উপর। তিনি যৌবন বয়স থেকে এখানে নায়েবি করছেন। মালিকের মন- মেজাজ, স্বভাব-চরিত্র সব কিছু জানেন। মালিক চলে যাবার পর সরকার নাদের আলিকে বললেন, এই ছেলেকে কাজে বহাল করার ব্যবস্থা করুণ।

নাদের আলির বয়সও নায়েবের কাছাকাছি। তিনিও অনেক দিন হল এখানে কাজ করছেন। মালিকের সব কিছু জানেন। বললেন, আমিও তা বুঝতে পেরেছি। তারপর শাকীলের দিকে চেয়ে বললেন, আপনার আগে যারা ইন্টারভিউ দিল, তাদের মধ্যে চার জন এম, এ, ছিল। আপনার ভাগ্য খুব ভাল।

শাকীল মুখে কৃতজ্ঞতার হাসি ফুটিয়ে বলল, সবই আল্লাহ পাকের মর্জি।

নায়ের এতক্ষণ শাকীলের পা থেকে মাথা পর্যন্ত লক্ষ্য করছিলেন। তার কথা শুনে বললেন, আল্লাহ'র মর্জির সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও তদবীর করতে হয়।

নাদের আলি সেই দিনই শাকীলকে নিয়োগ পত্র দিয়ে তার কাজ কিছু কিছু বুঝিয়া দিলেন।

কাচারিতে যারা কাজ করে সকলের খাবার চৌধুরী বাড়ী থেকে আসে। দুপুরের খাওয়ার পর শাকীল নায়েবকে বলল, নামায পড়বো কোথায়।

নায়েব কয়েক সেকেণ্ড তার দিকে চেয়ে থেকে বললেন, এখানে তো কেউ নামায পড়ে না। তাই নামায পড়ার ব্যবস্থা নেই। আপাততঃ আপনি পুকুর ঘাট থেকে অজু করে এসে একটা বেঞ্চের উপর পড়ুন, পরে ব্যবস্থা করা যাবে।

শাকীল সান বাঁধান ঘাট থেকে অজু করে এসে জোহরের নামায পড়ল। পরের দিন মাগরিবের নামায শাকিল, সান বাঁধান ঘাটের উপরে বসবার জন্য যে পাকা রক আছে, তাতে পড়ল। তারপর কাচারিতে ফিরে এল। এমন সময় একটা চাকর এসে বলল, ম্যানেজার সাহেবকে মালিক ডাকছেন।

নায়েব শাকীলকে বললেন, আপনি ওর সাঙ্গে যান। চাকরটা শাকীলকে সঙ্গে করে কাচারি বাঁড়ীর ভিতরের দিকের দরজা দিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। দরজা পার হয়ে অনেক খানি লম্বা বারান্দা। বারান্দার শেষ প্রান্তে একটা দরজার পর্দা ঠেলে ভিতরে ঢুকে চাকরটা বলল, আপনি বসুন। মালিক আসবেন। তারপর সে ঐ রুমের এক পাশের সিঁড়ি দিয়ে উপরে চলে গেল।

শাকীল একটা সোফায় বসে রুমটার চারদিকে দেখতে লাগল, বেশীর ভাগ আসবাব পত্র পুরানো আমলের। কিছু কিছু নতুন ও রয়েছে। দুপাশের দেওয়ালে চারটে বড় অয়েল পেন্টীং। বুঝতে পারল, এটা ভিতর বাড়ীর বৈঠকখানা। ছবিগুলোর দিকে তাকিয় তার মনে হল, এগুলো চৌধুরী সাহেবের পূর্ব পুরুষদের ছবি। সিঁড়িতে ভারী পায়ের শব্দ পেয়ে সেদিকে চেয়ে দেখল, লুংগী ও পাঞ্জাবী পরে চৌধুরী সাহেব নামছেন। শাকীল দাঁড়িয়ে পড়ল। নিচে নেমে এলে সালাম দিল।

চৌধুরী সাহেব সালামের উত্তর মুখে না বলে শুধু ডান হাতটা একটু উপরে তুলে বসতে বলে নিজে ও বসলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, কাজ কর্ম দেখে কি মনে হচ্ছে, পারবে?

শাকীল তৎক্ষনাৎ ধীর ও নম্রস্বরে বলল, কাজতো মানুষই করে। কাজকে যারা ভয় পায়, তারাই অকৃতকার্য হয়।

ঃ তোমাকে যে কাজের জন্যে নেয়া হয়েছে, তা খুব গুরত্বপূর্ণ। আপাততঃ যা করছ করে যাও। পরে আমি তোমাকে ধীরে ধীরে সে সব বুঝিয়ে বলবো। একটা কথা শুধু মনে রাখবে। আমার কথা বলে যে কেউ কোন কিছু করতে বললে, বিনা দ্বিধায় তা করে যাবে।

ঃ জী করবো। আমি দু এক দিনের মধ্যে বাড়ী যেতে চাই। বাড়ীতে সবাই চিন্তা করছেন। উনারা জানেন, আমি শুধু ইন্টারভিউ দিতে এসেছি।

ঃ তোমার কে কে আছে?

ঃ আব্বা আম্মা ও দাদী আছেন। একটা বোন ছিল তার বিয়ে হয়ে গেছে।

ইটারভিউ এর সময় চৌধুরীসাহেব শাকীলের বাবার নাম ও বাড়ীর ঠিকানা শুনে চাচাতো ভাই ইয়াসিনের কথা মনে পড়েছিল। এই ছেলে তাহলে ইয়াসিনের বন্ধুর ছেলে। এদের বাড়ীতেই ইয়াসিন চাচি আম্মাকে নিয়ে উঠেছিল এবং অনেকদিন সেখানে ছিল? এখন জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তোমার বাবার কাছে আমাদের কিছু কথা শুনেছ?

ঃ জী শুনেছি। তবে বেশী কিছু উনি বলেন নি। শুধু বলেছিলেন, আপনাদের বংশের একজন উনার বন্ধু ছিলেন। তিনি এখন ঢাকায় থাকেন।

চৌধুরী সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ঠিক আছে তুমি এখন যাও। আমি নায়েবকে বলে দেব, তুমি বাড়ী যেতে চাও যেও। কথা শেষ করে তিনি উপরে চলে গেলেন।

শাকীল ফিরে এলে নায়েব জিজ্ঞেস করলেন, চৌধুরী সাহেব ডেকে ছিলেন কেন?

ঃ কাজ কর্ম মন দিয়ে করতে বললেন। আমি দু একদিনের জন্যে বাড়ী যাবার কথা বলতে আপনাকে বলে যেতে বললেন।

ঃ কবে যেতে চান।

ঃ আগামীকাল।

ঃ তাই যাবেন।

শাকীল বাড়ীতে এসে আব্বা আম্মাকে সবকিছু জানাল।

সুরাইয়া খাতুন বিয়ের আগে যখন ইয়াসিন সাহেবের সঙ্গে মেলামেশা করতেন তখন উনার কাছে চৌধুরী বাড়ীর কথা কিছু শুনেছিলেন। বিয়ের পর স্বামী ও শাশুড়ীর কাছে চৌধুরী বাড়ীর বর্তমান মালিকের যৌবন বয়সের অনেক কৃকীর্তির কথা ও শুনেছেন। সেই বংশের ছেলে স্বামীর

বন্ধু ইয়াসিন সাহেব তাকে ভালবেসে বিয়ে করেছে, সে কথা মনে পড়লে মনে কষ্ট অনুভব করেন। এখন ছেলে সেখানে চাকরি করবে শুনে শংকিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোকে কি কাজ করতে হবে?

ঃ আপাততঃ হিসাব পত্র দেখতে হবে। তবে চৌধুরী সাহেব বললেন, আরো কি করতে হবে, তা পরে জানাবেন।

ঃ বেতন কত দেবে ঠিক হয়েছে?

ঃ থাকা খাওয়া, কাপড় চোপড় ফ্রি। বেতন চার হাজার।

ঃ তুই কি চিন্তা করেছিস? করবি?

ঃ তোমাদের অনুমতি পেলে করবো।

ঃ আমি একটা শর্তে অনুমতি দিতে পারি, চৌধুরী সাহেবের কথায় কোন দিন কোন অন্যায় কাজ করবি না।

ঃ তাতো নিশ্চয়। তুমি না বললে ও করতাম না।

ঃ সে বিশ্বাস আমাদের আছে। তবু মা হয়ে যা কর্তব্য তাই করলাম। রেদওয়ান এমনি গম্ভীর ধরনের লোক। অসুস্থ হবার পর আরো গম্ভীর হয়ে গেছেন। স্বামী কিছু বলছে না দেখে সুরাইয়া খাতুন তাকে বললেন, তুমি কিছু বলছ না কেন?

ঃ যা কিছু বলার তুমি তো বললে। আমারও ঐ একই কথা।

শাকীল বলল, আপনি দোওয়া করুন আব্বা, আমি যেন আপনাদের কথা মত এবং আল্লাহ ও তাঁর রসুলের (দঃ) প্রদর্শিত পথে আমরণ চলতে পারি।

রেদওয়ান ছল ছল নয়নে বললেন, সেই দোওয়া সব সময় করে আসছি। যাও তোমার দাদীর কাছে দোওয়া নাও।

শাকীল দাদীকে চাকরির কথা বলে দোওয়া করতে বলল।

ফৌজিয়া খাতুন দোওয়া করে বললেন, সব সময় আল্লাহকে স্মরণ রাখবি। কোন কারণেই নামায রোজা কাযা করবি না। ছোটদের স্নেহ এবং বড়দের সম্মান করবি। জান গেলে ও মিথ্যা বলবি না। কারো মনে কষ্ট দিবি না। আর ছোট হোক বড় হোক, কোন অন্যায় করবি না।

শাকিল বলল, দোওয়া করুন, আল্লাহ পাক যেন আপনার উপদেশ আমাকে মেনে চলার তওফিক এনায়েৎ করেন।

ফৌজিয়া খাতুন দোওয়া করে সুরাইয়া খাতুনকে ডেকে বললেন, বৌমা, আমার দাদু ভাইয়ের বয়স কত হল বলতো?

ঃ এবছর পাঁচিশে পড়েছে।

ঃ তা হলে এবার নাত বৌ এর ব্যবস্থা কর। তোমার শ্বশুর বলতেন, ছেলেদের বিয়ে পঁচিশ থেকে আঠাশের মধ্যে এবং মেয়েদের পনের থেকে আঠেরোর মধ্যে দেওয়া উচিৎ।

ঃ আমি ওর বিয়ের কথা আপনার ছেলেকে বলেছি। এখন আল্লাহ পাকের হুকুম।

ঃ নিজেদেরকে ও চেষ্টা করতে হয়।

ঃ তাতো করবই।

বিয়ের কথা শুনে শাকীল লজ্জা পেয়ে তাদের অলক্ষ্যে পালিয়ে এসে ঘর থেকে বেরিয়ে অনিসাদের বাড়ীতে রওয়ানা দিল। ঢাকা থেকে ফেরার সময় গুলজার তার হাতে বাড়ীর জন্যে কিছু টাকা পাঠিয়েছে। ঢাকা থেকে আসার পরের দিন সে ইন্টারভিউ দিতে মেহেরপুর চলে গিয়েছিল।

গুলজাররা দু ভাই দু বোন। বড় দুবোনের পর গুলজার। সব থেকে ছোট ফরিদ। সে ক্লাস টেনে পড়ে। বড় দু বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। শাকীল যখন তাদের বাড়ীর কাছে পৌছাল তখন ফরিদ স্কুল থেকে ফিরছিল। সে শাকীলকে বড় ভাইয়ের বন্ধু হিসাবে ভাইয়া বলে ডাকতো। এখন ভাবীর ভাই হিসাবে বেয়াই হলে ও আগের মত ভাইয়া বলে ডাকে। তাকে দেখতে পেয়ে কাছে এসে সালাম দিয়ে বলল, ভাইয়া কেমন আছেন?

শাকীল সালামের উত্তর দিয়ে বলল, ভাল। তুমি ভাল আছ?

ঃ জী ভাল আছি। চলুন বাড়ীতে চলুন।

ফরিদকে সঙ্গে করে শাকীল তাদের বাড়ীতে এসে তালই মাওইকে সালাম দিয়ে কদমবুসি করে কুশল জিজ্ঞেস করল।

উনারা সালামের উত্তর দিয়ে দোওয়া করে বললেন, আল্লাহ পাকের রহমতে ভাল আছি বাবা।

শাকীল তালইয়ের হাতে টাকা দিয়ে বলল, আমি ঢাকা গিয়েছিলাম। গুলজার এগুলো পাঠিয়েছে। ওরা ভাল আছে।

উনারা তাকে থাকতে বললেন।

শাকীল চাকরিতে যেতে হবে বলে নাস্তা খেয়ে বাড়ী ফিরে এল। দু দিন বাড়ীতে থেকে শাকীল মেহেরপুরে ফিরে এল।

তিন

নায়েব ও সরকার এক বয়সি হলেও গোমস্তার বয়স তাদের চেয়ে কম। কাচারি বাড়ীতে তাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা। প্রথম বারে এসে শাকীল তাদের সঙ্গে ছিল। এবারে এসে দেখল, ভিতর বাড়ীর বৈঠকখানার পাশের রুমে তার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। কাজের জন্য কাচারিতে অন্য একটা আলাদা রুমে অফিস করা হয়েছে। সেই রুমের এক পাশে নামায পড়ার জন্য একটা দামী ;মসাল্লা বিছান রয়েছে। এবারে আসার পর নায়েবের কথা মত শাকীল অফিস রুমে কাজ করছে। সে লক্ষ্য করল, কাচারীর সবাই তাকে আগের থেকে বেশী সমীহ করছে। আর সব চাকর চাকরানিরাও তাকে ভয় ভয় করছে। দিনে সকলের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করলেও রাতে তাকে নিজের রুমে খেতে হয়। এসব ব্যাপারে শাকিল একদিন সরকারকে জিজ্ঞেস করতে তিনি বললেন, চৌধুরীসাহেবের হুকুম। উনার হুকুমের বাইরে কোন কিছু হবার উপায় নেই। আপনি কিছু দিন থাকুন, আস্তে আস্তে সব কিছু বুঝতে পারবেন।

শাকীল অভ্যাস মত একদিন ভোরে উঠে ফজরের নামায পড়ে কোরান শরীফ তেলাওয়াত করছিল। দরজায় কারো করাঘাত শুনে কোরান শরীফ বন্ধ করে চিন্তা করল, কে হতে পারে? কাজের মেয়ে নয়তো? কিন্তু সে এখন কেন আসবে? ভিতর বাড়ীর একজন আধা বয়সী কাজের মেয়ে তাকে খাওয়া দাওয়া করায়। প্রতিদিন সকাল বিকেল তার রুম ঝাড়ু দেয়। বিছানা পত্রও ঝেড়ে ঠিক করে দিয়ে যায়।

দরজায় আবার বেশ জোরে ধাক্কা দেবার আওয়াজ পেয়ে কোরান শরীফ টেবিলের উপর রেখে দরজা খুলে দেখল, চৌধুরী সাহেবের বডিগার্ড হীরু। এর মধ্যে একদিন হীরুর সঙ্গে শাকীলের অনেক কথা হয়েছে। তার পরিচয় এবং তার কি কাজ সব জেনেছে। আজ এই সময়ে তাকে দেখে বেশ অবাক হয়ে সালাম দিয়ে বলল,কি খবর হীরু চাচা, এমন সময়ে?

হীরু সালামের প্রতি উত্তর দিয়ে বলল, মালিকের হুকুম আপনাকে লাঠিয়াল হতে হবে।

কথাটা শুনে শাকীল চমকে উঠল। তারপর চিন্তা করল, লাঠিয়াল হতে কোন দোষ নেই বরং ভাল। প্রয়োজনে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লাঠিয়ালি করা

যাবে। তখন তার চৌধুরী সাহেবের কথা মনে পড়ল–" আমার নাম করে যে কেউ কোন কাজ করতে বললে করবে।"

শাকীলকে দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে দেখে হীরু বলল, কই আসুন দেরী করছেন কেন?

শাকীল লুংগী পাঞ্জাবী ছেড়ে পাজামা ও গেঞ্জী গায়ে দিয়ে বেরিয়ে এল।

হীরু তাকে মূল বাড়ীর পিছনের নিয়ে গেল। নানারকম গাছপালার মাঝখানে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা। একপাশে একটা পাকা রুম। হীরু সেই রুম থেকে দুটো পাঁচহাতি লাঠি নিয়ে এসে একটা শাকীলের হাতে দিয়ে নিজে অন্যটা নিয়ে কিছুক্ষণ লাঠি খেলার প্রথম অনুশীলনগুলো দেখিয়ে বুঝিয়ে দিল। তারপর তাকে অনুশীলন করাতে লাগল। প্রায় ঘন্টা খানেক অনুশীলন করার পর হীরু বলল, আজ এ পর্য্যন্ত থাক। আপনি প্রতিদিন রেডী থাকবেন, আমি ডেকে নিয়ে আসবো। আর শুনুন, আপনি যা কিছু করছেন এবং করবেন, সে সব কারো কাছে প্রকাশ করবেন না।

শাকীল বুঝতে পারল, এটা ও চৌধুরী সাহেবের হুকুম। বলল, ঠিক আছে তাই হবে।

শাকীল কমার্স নিয়ে ডিগ্রী পাশ করেছে। ছাত্র হিসাবেও বেশ ভাল ছিল। এক সপ্তাহের মধ্যে সব কিছু বুঝে নিয়ে নিজে খাতাপত্র চেক করতে লাগল। নায়েব তাকে গত বিশ বছরের প্রত্যেক বছরের আয় ব্যয়ের হিসাব করতে বলেছেন। খাতা পত্রে প্রথম দিকে ছোট খাট ভুল দেখতে পেয়ে ভিতরের দিকে ভাল করে চেক করতে গিয়ে ক্রমশঃ বড় বড় অংকের ভুল দেখতে পেল। হঠাৎ শাকীলের মনে হল, চৌধুরী সাহেব বোধ হয় কিছু টের পেয়েছেন। তাই তাকে দিয়ে চেক করাচ্ছেন। শাকীল কাউকে কিছু জিজ্ঞেস না করে এক মাসের মধ্যে বিশ বছর আগের এক বছরের স্টেটমেন তৈরী করল। তাতে ঐ একবছরেই পঁচিশ হাজার টাকার নগদ ক্যাশ কারচুপি হয়েছে। চিন্তা করল, নায়েব বা সরকারকে খাতাটা দেখাবার আগে চৌধুরী সাহেবকে ব্যাপারটা জানান উচিৎ। এবারে আসার পর থেকে চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে মাত্র একবার দেখা হয়েছে। সে সময় সালাম ও কুশলাদি বিনিময় ছাড়া আর কোন কথা হয়নি। আর একদিন সান পুকুর থেকে অজু করে আসার সময় দোতলার বারান্দায় বেগম সাহেবের সাথে উনাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মাথা নিচু করে চলে এসেছে। আজ রাতে

খাবার পর কাজের মেয়েটা বলল, সহেব আপনাকে ডেকেছেন। আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

শাকীল মনের মধ্যে অজানা এক আতংক নিয়ে তাকে অনুস্বরণ করল। দোতলায় উঠে সিঁড়ির পাশের রুমের দরজার কাছ এসে কাজের মেয়েটা বলল, আপনি ভিতর গিয়ে বসুন।

শাকীল ভিতরে ঢুকে বুঝতে পারল, এটা ও একটা ড্রইংরুম। এখানকার আসবাবপত্র সব এ যুগের। দেওয়ালে চৌধুরী সাহেবের ও ইয়াসিন সাহেবের কলেজে পড়ার সময়কার একটা যুগল ফটোর দিকে তাকিয়ে চিনবার চেষ্টা করল। চৌধুরী সাহেবকে একটু একটু চিনতে পারলে ও ইয়াসিন সাহেবকে চিনতে পারল না।

চৌধুরী সাহেব রুমে ঢুকে তাকে ফটোর দিকে চেয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন। ফটোর মালিকদের চিনতে পারলে?

শাকীল চৌধুরী সাহেবের গলার আওয়াজ শুনে ঘুরে সালাম দিয়ে বলল, একজন খুব সম্ভব আপনি। অন্য জনকে চিনতে পারছি না।

চৌধুরী সাহেব তাকে বসতে বলে নিজেও বসে বললেন, অন্যজন আমার চাচাতো ভাই। যে তোমার বাবার বন্ধু। এখন বল, সব কিছু কি রকম চলছে?

শাকীল বলল, এখন মনে হয়, সব কিছু ঠিকমত চলছে। তবে আগে ঠিক মত চলেনি।

: যেমন?

: আমি গত বিশ বছর আগের এক বছরের হিসাব দেখেছি। তাতে পঁচিশ হাজার টাকার গোলমাল আছে।

চৌধুরী সাহেবের মুখে এক ঝিলিক হাসি ফুটে মিলিয়ে গেল। বললেন, বাকি বছরগুলোর হিসাব করে যাও। আর সেই সঙ্গে চলতি হিসাবের দিকেও লক্ষ্য রাখবে। তুমি কি এর মধ্যে বাড়ী যাবে?

: কবে যাব এখানো ঠিক করিনি।

: তাড়াতাড়ি ফিরে এস। তোমাকে কাঞ্চনপুরে যেতে হবে। ওখানকার প্রজারা বেশ কয়েক বছর ধরে ঠিকমত ফসলের ভাগ দিচ্ছে না।

এমন সময় চৌধুরী সাহেবের স্ত্রী নাগিনা বেগম ঘরে ঢুকলেন।

শাকীল দাঁড়িয়ে সালাম দিয়ে মাথা নিচু করে নিল।

নাগিনা বেগম সালামের উত্তর দিয়ে তাকে বসতে বলে নিজেও বসলেন। তারপর স্বামীর দিকে চেয়ে বললেন, তোমাদের কাজের কথা শেষ হয়েছে?

চৌধুরী সাহেব স্ত্রীর কথার উত্তর না দিয়ে উঠে চলে গেলেন।

নাগিনা বেগম শাকীলকে বলেলন, তুমি অমন মাথা নিচু করে বসে রয়েছে কেন? আমি তো তোমার আম্মার মত। আল্লাহ পাক দিলে তোমার মত আমার ছেলে থাকতে পারত। কথা শেষ করে তিনি চোখের পনি মুছলেন।

শাকিল উনার ভিজে গলা শুনে তাকিয়ে দেখল, উনি চোখ মুছছেন। সে জানে চৌধুরী সাহেব নিঃসন্তান। তাড়াতাড়ি উঠে এসে কদমবুসি করে বলল, বেয়াদবি মাফ করবেন, আমাকে ছেলে মনে করেছেন জেনে নিজেকে ধন্য মনে করছি। জানলাম আজ থেকে এখানেও আমার একটা আম্মা আছেন।

নাগিনা বেগম চোখের পানি রোধ করতে পালেন না। বললেন, সেই কথা ভেবেই তো তোমাকে আজ এখানে আনিয়েছি। তারপর মাথায় হাত বুলিয়ে চুমো খেয়ে আবার বললেন, থাক বাবা থাক, বেঁচে থাক। তোমার কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো?

ঃ জী না, বরং অনেক ভাল আছি।

ঃ কোন অসুবিধে হলে জানাবে। এখন যাও ঘুমাওগে, অনেক রাত হয়েছে।

শাকীল সালাম জানিয়ে ফিরে এসে চিন্তা করল, আল্লাহ পাকের কি কুদরত, এতবড় ষ্টেট, অথচ ভোগ করার কেউ নেই। কয়েকদিন পর নায়েবকে বলে শাকীল বাড়ী গেল।

শাকীল বাড়ী যাবার পর একদিন রাতে নায়েব, সরকার ও গোমস্তা গোলটেবিলে বসলেন। নায়েব বললেন, আপনারা ম্যানেজার ছোকরাকে কি রকম বুঝছেন?

সরকার বললেন, প্রথমে আপনি বলুন, কি বুঝেছেন?

নায়েব বললেন, ছোকরাটাকে খুব বোকা বলে মনে হয় না। লোভী ও চালাক হতে পারে। তবে সে যে ধার্মিক তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সরকার বললেন, সে বোকা না চালাক বুঝি না। তবে ধার্মিক এ কথা আমিও বুঝেছি। তারপর নায়েবের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার সামনে

আপনি যেদিন পুরোনো এক বছরের হিসাব ঠিক আছে কিনা জিজ্ঞেস করলেন, সেদিন ধর্মের কত কথা বলল শুনলেন না? "আপনারা আমার বাবার বয়সি। মিথ্যা বলব না, হিসাবে যথেষ্ট গোলমাল আছে। আপনারা বহুদিন থেকে এখানে কাজ করছেন।। ছেলে হয়ে আপনাদের কাছে হাত জোড়ো করে অনুরোধ করছি, এখন আর কোন অন্যায় করবেন না। যা করেছেন, সে জন্যে আল্লাহ পাকের কাছে কেঁদে কেঁদে মাফ চেয়ে নেন। আপনাদের কি মউতের, কবরের ও দোযখের ভয় নেই? কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ পাকের কাছে কোন মুখ নিয়ে দাঁড়াবেন? সেই সব কথা স্মরণ করে তওবা পড়ে নামায পড়ুন। কারণ নামাযই মানুষকে অসৎ পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারে। সে কথা আল্লাহ পাক কোরান মজিদে এবং রসুলে পাক (দঃ) য়ের হাদিসে আছে। আপনারা কি জানেন না, হাদিসে আছে " অন্যের ক্ষতি করলে ভবিষ্যতে নিজের ক্ষতি হয়?"

গোমস্তা বলে উঠলেন, আমাকে ও একদিন ঐ সব কথা বলেছে।

নায়েব বললেন, সবই তো বুঝলাম। কিন্তু হিসাবের গোলমালের কথা চৌধুরী সাহেবকে বলেছে কিনা সেটাই চিন্তার কথা। একটা কথা বলে রাখি, আমাদেরকে এখন সৎ সেজে কাজ করে যেতে হবে। সেই সঙ্গে ছোকরাটাকে সরবার ব্যবস্তা করতে হবে। ও থাকলে একদিন না একদিন আমাদেরকে চৌধুরী সাহেবের কাছে ধরা পড়তে হবে। চৌধুরী সাহেব একদিন বললেন, এ বছর ফসল ওঠার সময় ছোকরাটাকে কাঞ্চনপুরে পাঠাবেন। তারপর গোমস্তার দিকে চেয়ে বললেন, আপনার বাড়ী সেখানে। আর ঐখান থেকে সবচেয়ে কম ফসল উসুল হয়। তাই মনে হয় চৌধুরী সাহেবের মনে সন্দেহ হয়েছে। খুব সম্ভব আপনি তার সঙ্গে যাচ্ছেন না। আপনি চিঠি দিয়ে আপনার ছেলেকে ঘটনাটা জানিয়ে বাছাধনকে একেবারে শেষ করে দেবার ব্যবস্থা করুন। নচেৎ ফিরে এলে চৌধুরী সাহেব আপনাকে ছেড়ে কথা বলবেন না।

সরকার বললেন, আমরা মানেজারকে যা ভাবছি, তা নাও হতে পারে। তা না হলে হিসাব পত্রে আমাদের কারচুপি জেনে ও কেন কিছু করল না?

নায়েব মৃদু হেসে বললেন, বুঝলেন না, ছোকরা বহুৎ চালাক। কিছু করলে আমরাও যে তার বিরুদ্ধে কিছু করবো, সে কথা ভেবে কিছু করতে সাহস পায়নি। তবে কিছু না করার আরো একটা কারণ থাকতে পারে, আমাদের কাছ থেকে হয়তো কিছু মালপানি পেতে চায়। সে কথা সরাসরি

বলতে না পেরে ধর্মের কথা বলেছে। আরে বাবা, এই কলিযুগের ছেলে-দেরকে জানতে আমার বাকি নেই।

সরকার বললেন, দেখা যাক না , এবারে এসে কি করে।

সেদিনের মত গোলটেবিল শেষ করে যে যার ঘুমোতে গেল।

নায়েব জমীরুদ্দিন যেমন খুব চতুর তেমনি সার্থপর। একে শাকীল ম্যানেজার হয়ে আসার পর তার সার্থে ঘা পড়েছে। তার উপর আজ যখন চৌধুরী সাহেব বললেন, শাকীল যা কিছু করুক না কেন কোন কৈফিয়েৎ তলব করবেন না। তখন থেকে তিনি তার উপর ভীষণ রেগে আছেন। এতদিন তিনি সকলের উপর জোর জুলুম করে লুটে পুটে খাচ্ছিলেন। ভয়ে কেউ টু শব্দ পর্য্যন্ত করতে পারেনি। আর ঐ পুচকে ছোকরা কিনা দুদিন এসে তাকে টপকে গেল? কি করে তাকে এখান থেকে সরান যায় চিন্তা করতে লাগলেন। সরকারকে দলে টানা যাবে না। সে ভীতু। গোমস্তাকে দিয়ে কাজটা করাতে হবে। একদিন গোপনে গোমস্তার সঙ্গে পরামর্শা করে ঠিক হল, কাঞ্চনপুরে ম্যানেজার গেলে তার ছেলে তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করবে।

শাকীল প্রায় দুমাস পরে বাড়ীতে এল, সুরাইয়া খাতুন ও ফৌজিয়া খাতুন তার স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখে খুশী হয়ে দোয়া করলেন।

রেদওয়ান এখন আগের থেকে একটু সুস্থ্য হয়েছেন। অল্প অল্প হাঁটতে পারেন। তিনি ও খুশী হলেন।

পরের দিন সকালে নাস্তা খাবার সময় রেদওয়ান বললেন, ও পাড়ার সারোয়ার ভাই একটু আগে এসেছিল। সে কি কাজে ঢাকা গিয়েছিল। ফেরার সময় আনিসাকে দেখতে গিয়ে জানতে পারে, গুলজার একসিডেন্ট করে আহত হয়ে হাসপাতালে আছে। তুমি গিয়ে তাকে দেখে এস।

সুরাইয়া খাতুন শুনে চমকে উঠে বললেন, উনি হাসপাতলে গিয়ে গুলজারকে দেখে আসেনি?

ঃ সে কথা আমি তাকে জিজ্ঞেস করিনি।

সুরাইয়া খাতুন চোখের পানি মুছে শাকীলকে বললেন, তুই নাস্তা খেয়ে ঢাকা যা। মেয়েটা হয়তো খুব কাঁন্নাকাটি করছে। আল্লাহ পাক তুমি আমার মেয়ে জামাইকে সহিমালামতে রেখ।

শাকীল ঐ দিন ঢাকা রওয়ানা হল। আনিসাদের বাসায় গিয়ে তাকে পেল না। কাজের মেয়েটা বলল, আপা কিছুক্ষণ আগে মেডিকেলে গেছে।

শাকীল ব্রীফকেসটা রেখে মেডিকেলে যাবার মনস্থ করে জিজ্ঞেস করল, কত নাম্বার ওয়ার্ডে আছে জান?

ঃ বার নাম্বার ওয়ার্ডে। আমি আপার সঙ্গে একদিন গিয়েছিলাম।

শাকীল মেডিকেলে এসে দেখল, গুলজার বেডের পাশে দাড়িয়ে আছে। আর আনিসা সব কিছু গুছিয়ে ব্যাগে ভরছে। শাকীল সালাম দিয়ে তাদের কাছে এগিয়ে এসে বলল, রীলিজ হয়ে গেল বুঝি?

হাঁ বলে গুলাজার ও আনিসা একসঙ্গে সালামের উত্তর দিল। আনিসা প্রথমে ভাইয়াকে ও পরে স্বামীকে কদমবুসি করে ঘরের সবাইয়ের কথা জিজ্ঞেস করল।

শাকীল বলল, আমাদের ঘরের সকলের খবর ভাল। তবে তোর শ্বশুর বাড়ীর খবর বলতে পারব না। গতকাল মেহেরপুর থেকে এসেছি। আজ সকালে গুলজারের এ্যাকসিডেন্টের কথা শুনে চলে এলাম।

মেহেরপুরে চৌধুরী স্টেটে চাকরি হবার পর শাকীল গুলজার ও আনিসাকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে। আনিসা বলল, জান ভাইয়া, তোমার বন্ধু না ব্যাংকের কর্মচারী ইউনিয়ানের তাকে কথাটা গুলজার শেষ করতে দিল না। বলল, এই কি হচ্ছে? এটা হাসপাতাল না? তোমার জিনিস পত্র সব নেয়া হলে চল।

ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে শাকীল গুলজারকে জিজ্ঞেস করল, কি করে এ্যাকসিডেন্ট হল?

ঃ রাস্তা পার হবার সময় একটা বাসের ধাক্কায় পড়ে গিয়ে পায়ে ও মাথায় খুব আঘাত পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম।

গেটে এসে আনিসা বলল, একটা বেবী নাও।

শাকীল তাদেরকে বেবীতে তুলে দিয়ে বলল, তোরা যা। আমি একজনের সঙ্গে দেখা করে পরে আসছি।

আনিসা বলল, কালকে দেখা করলে হতো না।?

শাকীল বলল, বিয়ের পর তোর সাহস তো খুব বেড়ে গেছে দেখছি। বেয়াদবের মতো আমার কথার ওপর কথা বলছিস।

গুলজার বলে উঠল, বাসায় এসে খুব শাসন করে দিস। মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে ও বেয়াদবি করে।

কথাটা শুনে আনিসাকে লজ্জা পেতে দেখে শাকীল বলল, ঠিক আছে এখন যা, আমি এসে যা করার করব। তারপর বেবীওয়ালাকে বলল, আপনি স্টার্ট দেন তো ভাই।

ওরা চলে যাবার পর শাকীল হাঁটতে হাঁটতে চিন্তা করতে লাগল, শাকিলাদের বাসায় তার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া ঠিক হবে কিনা? বাড়ীতে আব্বা যখন গুলজারকে দেখতে ঢাকায় আসতে বললেন, তখন তার শাকিলার কথা মনে পড়ে পুলক অনুভাব করে ভেবেছিল, তাদের বাসায় যাবে। এখন তাদের বাসায় যাবার কথা চিন্তা করতে মনে সেই রকম পুলক অনুভব করল। আবার চিন্তা করল, তাদের বাসায় গেলে শাকিলা তাকে তার আব্বার গরিব বন্ধুর ছেলে জেনে কি ভাববে যদি ভাবে ছেলেটা নিজের সত্বাকে ভুলে জেনে শুনে বাপের বড় লোক বন্ধুর মেয়ের সঙ্গে ভাব করতে এসেছে। এই সব চিন্তা করতে করতে বাংলা একাডেমীর রাস্তা পার হয়ে হাইকোর্টের রাস্তার ফুটপাত দিয়ে আসছিল। তখন সন্ধ্যে হতে বেশী দেরী নেই। অল্প দুর থেকে দেখতে পেল, শিশু একাডেমীর গেটের কাছে চারজন লারে লাপ্পা ধরনের ছেলে ও শালওয়ার কামিজ পরা একটা মেয়ে খুব হাসাহাসি করছে। শাকীল গেটের কাছ এসে তাদেরকে পাশ কার্টিয়ে আসবে, ঠিক সেই সময় মেয়েটা জড়িয়ে ধরে বলল, সেই কখন থেকে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি। মেয়েটা জড়িয়ে ধরার সঙ্গে সঙ্গে ঐ চার জন ছেলে শাকীলের হাতের ঘড়ি এবং পকেটে যা কিছু ছিল সব ছিনিয়ে নিয়ে মেয়েটাকে সরে যেতে বলল। মেয়েটা সরে যেতে সবাই মিলে শাকীলকে মারতে লাগল।

শাকীল চিন্তার মধ্যে একটু অনমনস্ক ছিল। তাছাড়া এরকম ঘটনা যে ঘটতে পারে তা সে কল্পনা ও করে নাই। হঠাৎ ঘটে যেতে সে প্রথমে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। ব্যাপারটা উপলব্ধি করে যখন সে তাদেরকে শায়েস্তা করার জন্যে প্রস্তুতি নিল তখন তার কানে আকাংখিত একটা মেয়ের শ্রুতি মধুর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, কি ব্যাপার ভাই? উনাকে মারধর করছেন কেন?

শাকিলার বান্ধবী চৈতি শিশু একাডেমীতে চাকরি করে। সে অনেক আগে তার কাছে এসেছে। শাকিলা আজ সন্ধ্যায় শুধু বান্ধবীদের নিয়ে একটা পার্টি দিচ্ছে। সে চৈতীকে আজ ছুটি নিতে বলেছিল। কাজের চাপ থাকায় চৈতি বলেছে, ছুটি পাব না। তবে ছুটির পর আসবো। চারটেয় ছুটি হবার পর

কাজ থাকায় বসের হুকুমে কাজ করতে হচ্ছে। সে কথা ফোনে শাকিলাকে জানিয়েছে। তাই সব কিছু ব্যবস্থা করে শাকিলা চৈতিকে নিয়ে যেতে এসেছিল। সঙ্গে করে নিয়ে যাবে বলে সে এতক্ষণ চৈতির কাজ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করছিল। তারপর তাকে নিয়ে গাড়ীতে করে ফেরার সময় গেটের বাইরে মারামারি দেখে ড্রাইভার গাড়ী থামাতে বাধ্য হয়েছে। শাকিলা জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে তাদেরকে ঐ কথা জিজ্ঞেস করল। ছেলেগুলো গাড়ী দেখে ও শাকিলার কথা শুনে শাকীলকে ছেড়ে দিতে শাকিলা তাকে চিনতে পেরে খুব অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল।

তাদের মধ্যে একটা ছেলে তাদের দলের মেয়েটাকে দেখিয়ে বলল, দেখুন না আপা, এই শালা ভদ্রলোকের বাচ্চা, আমার বোনের হাতে দুশো টাকা দিয়ে হোটেলে নিয়ে যেতে চাচ্ছিল। তাই একটু ধোলাই করছিলাম।

কথাটা শুনে শাকিলার গা যিন যিন করে উঠল। সেই সঙ্গে শাকীলের প্রতি তার প্রচণ্ড রাগ ও ঘৃনা জন্মাল। সে আর কোন কথা না বলে মাথাটা গাড়ীর ভিতর ঢুকিয়ে নিয়ে ড্রাইভারকে গাড়ী ছেড়ে দিতে বলল।

শাকিলার গাড়ী চলে যাবা পর তাকে আর তারা মারধর করল না। কারণ প্রথমতঃ তাদের আসল উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ সেখানে অনেক পথিক দাঁড়িয়েছে। তারা আসল ঘটনা জেনে গেলে হিতে বিপরিত হয়ে যাবে। তাই সেই ছেলেটা শাকীলকে বলল, যান এবার ভদ্রলোকের ছেলের মত চলে যান, নচেৎ জানে শেষ করে দেব।

তাদের হুমিক শুনে প্রতিশোধ নেবার জন্য শাকীলের প্রচণ্ড রাগ হ'। কিন্তু সামলে নিল। চিন্তা করল, পথিকরা মেয়ে ঘটিত ব্যাপার শুনলে তাকে ছেড়ে কথা বলবে না। তার কথা কেউ বিশ্বাসও করবে না। তাই চুপচাপ একটা রিক্সায় উঠে শাহাজানপুর যেতে বলল। একটার পর একটা অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে যেতে দেখে শাকীল কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে গড়ে ছিল। এখন রিক্সায় বসে সেই কথা ভাবতে গিয়ে তার মনে হল, শাকিলা এই বিশ্রী ঘটনা দেখে শুনে নিশ্চয় আমাকে খুব খারাপ ছেলে ভেবে গেল। এরপর আমি তার সঙ্গে দেখা করতে যাব কি করে?

বাসায় এলে গুলজার তার অবস্থা দেখে জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার? তোর মন অত খারাপ কেন? কার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলি? তারপর তার দিকে ভাল করে চেয়ে আতংকিত স্বরে জিজ্ঞেস করল, তোর জামা কাপড়ের অবস্থা এরকম কেন?

শাকীল বলল, তুই থামতো, বড় বেশী কথা বলিস। তারপর আনিসাকে বলল, পনেরটা টাকা দে, রিক্সা ওয়ালা দাঁড়িয়ে আছে।

অনিসা টাকা এনে দিলে শাকীল রিক্সাওয়ালাকে দিয়ে এসে বলল, ব্যাপার কিছু হয় নি। তোদের এই রাজধানীতে এসে হাইজাকারদের পাল্লায় পড়েছিলাম। তারা মারধর করে যা ছিল সব কেড়ে নিয়ে ছেড়ে দিল।

গুলজার বলল, অমন ষাঁড়ের মত গতর নিয়ে কিছু করতে পারলি না?

আনিসা স্বামীকে ধমকের সুরে বলল, তুমি চুপ কর। তারপর ভাইয়ার একটা হাত ধরে ভিজে গালায় বলল, শরীরে কোথাও জখম হয়নি তো?

শাকীল বোনের চোখে পানি দেখে বলল, না রে পাগলি না, কোথাও জখম হয় নি।

আরো দুদিন থেকে শাকীল বাড়ী ফিরে এল।

শাকিলার বান্ধবী চৈতি ফেরার পথে তার মন খারাপ দেখে বলল, কিরে তোর আবার কি হল? মনে হচ্ছে ঐ ছেলেটাকে তুই চিনিস?

শাকিলা ষ্টেডিয়ামে বল খেলা দেখতে গিয়ে শাকীলের সঙ্গে কিভাবে পরিচয় হয়েছিল, সেই ঘটনা বলল।

চৈতি বলল, আজকাল মানুষ চেনা বড় কঠিন। ছেলেটা ভীষণ ধূর্ত। তাই অপমানিত হয়ে ও ফাঁদে ফেলার জন্য সাহায্য করার অজুহাতে তোর মন জয় করার চেষ্টা করেছিল।

ঃ তুই ঠিক কথা বলেছিস। সেদিন পরিচয় হবার পর ছেলেটাকে ভাল মনে করেছিলাম। রাত্রে ঘুমোবার সময় শাকিলার মনে বিকেলের ঘটনাটা মনে পড়ল, প্রথম দিন পরিচয় হবার পর থেকে তার কথা প্রায় মনে পড়ে। তাকে ;আর দশটা ছেলের চেয়ে আলাদা মনে করেছিল। কিন্তু আজ তার আর এক রূপ দেখে শিউরে উঠে চিন্তা করল, ভাগ্যিস তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক হবার আগে তার আসল রূপ দেখতে পেলাম, নচেৎ কি হত আল্লাহ পাক জানেন।

এক সপ্তাহ বাড়ীতে থেকে শাকীল কর্মস্থলে ফিরে এল। দিন পনের পর একদিন হীরু লাঠি খেলার সময় বলল, আপনি এই দু আড়াই মাসে যা শিখেছেন, তা এক বছরে ও কেউ শিখতে পারে না। এবার তলোয়ার ও ছুরি খেলা শিখতে হবে। তিন মাস প্রাকটিস করে শাকীল ঐ গুলোতেও দক্ষতা অর্জন করল। তারপর কিছুদিনের মধ্যে সুটিং এ ও পারদর্শীতা লাভ করল।

একদিন হীরু শাকীলকে বলল, চৌধুরী সাহেবের কথা মত আমি আপনাকে সব বিদ্যা শিখিয়েছি। আপনার মত সাগরেদ পাইনি। তাই এতদিন কাউকে শেখায় নি। আপনাকে মনের মত পেয়ে মন উজাড় করে শিখিয়েছি। এখন আপনি পুরো ওস্তাদ বনে গেছেন।

শাকীল হীরুর পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে বলল, হীরু চাচা, আপনি এই সব খেলা শেখাবার জন্য যে দিন প্রথম হাতে খড়ি দেন, সে দিন থেকে মনে মনে আপনাকে ওস্তাদ বলে স্বীকার করেছি। আজ তা প্রকাশ্যে স্বীকার করলাম। দোওয়া করুন, আমি যেন সব সময় ন্যায় পথে থেকে দুর্বলের সাহায্যকারী হতে পারি।

হীরু বলল, দোওয়া করবো কি? সেই প্রথম দিন থেকে সব সময় করেই আসছি। আর সারা জীবন করেও যাব। আপনি চৌধুরী বাড়ীর ও কাচারি বাড়ীর সবাইকে এমন কি চাকর চাকরানীদেরকেও পর্য্যন্ত নামায পড়া না পড়ার সুফল কুফল জানিয়ে নামায ধরিয়েছেন। রাত তিনটের দিকে আপনি যখন কোরান পড়েন তখন চৌধুরী সাহেব ও বেগম সাহেবের সঙ্গে আমি ও শুনি। আপনার গলার স্বর এত সুন্দর, তা আমি কোন মৌলানা বা হাফেজের গলাতে শুনিনি। শুধু নায়েব আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট। তিনি নামায পড়েন নি ঠিক। দেখবেন অল্প দিনের মধ্যে তিনিও শুধরে যাবেন।

শাকীল আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করে বলল, প্রত্যেক মুসলমানের যা কর্তব্য তাই আমি করেছি। বাকি সব কিছু আল্লাহ পাকের মর্জি।

প্রায় একবছর হয়ে এল শাকীল এখানে কাজ করছে। এর মধ্যে কয়েকবার বাড়ীর সবাইকে দেখা দিয়ে এসেছে। মাঝে মাঝে বেগম সাহেব তাকে উপরে ডেকে ভালমন্দ জিজ্ঞেস করেন। তখন চৌধুরী সাহেব সেখানে থাকেন না। আজ রাতে চৌধুরী সাহেব তাকে ডেকে পাঠালেন।

উপরে এসে পর্দা ঠেলে রুমে ঢুকে শাকীল দেখল, চৌধুরী সাহেব একটা কৌচে বসে আছেন। সালাম দিয়ে বলল, কেমন আছেন?

চৌধুরী সাহেব সালামের জবাব দিয়ে তাকে বসতে বললেন।

চৌধুরী সাহেবকে আজ সালামের জবাব মুখে দিতে শুনে শাকীল মনে মনে আল্লাহ পাকের শোকর গুজারী করল।

এমন সময় দরজার বাইরে হীরুর গলার শোনা গেল, মালিক।

চৌধুরী সাহেব বললেন, ভিতরে আয়। হীরু ভিতরে এসে এক পাশে দাঁড়াল।

চৌধুরী সাহেব শাকীলকে বললেন, কাঞ্চনপুরে যাবার ব্যবস্থা হয়েছে। তুমি নায়েবের সঙ্গে এই ব্যাপারে কথা বলবে। হীরুর ছেলে ফজু তোমার সঙ্গে যাবে। সে তার বাবার মত সব বিষয়ে পারদর্শী। তোমাদের দুজনের কাছে ছুরী ও পিস্তল থাকবে। তবে সে খবর কেউ জানবে না। শুধু ফজুর হাতে লাঠি থাকবে। তারপর হীরুকে বললেন, তোর ছেলেকে এনেছিস?

ঃ জী মালিক। সে বাইরে অপেক্ষা করছে।

ঃ এখানে নিয়ে আয়।

হীরু বাইরে গিয়ে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এল।

ফজু সালাম দিয়ে বাবার পাশে দাঁড়াল।

শাকীল তাকে লক্ষ্য করল, বাবার মত অত লম্বা না হলেও বেশ হিষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ চেহারা। রংটা বাবার মত বেশ কাল।

চৌধুরী সাহেব ফজুর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে শাকীলের দিকে চেয়ে বললেন, পরশু বিকেলে কাচারির সামনের মাঠে তোমাদের দুজনের লড়াইয়ের প্রতিযোগীতা হবে। যে জিতবে সে বেশী পুরস্কার পাবে। তবে একটা কথা মনে রেখ, প্রতিযোগীতা করতে গিয়ে কেউ কাউকে আহত করবে না। অন্যায়ের আশ্রয় নেবে না। আমি দেখতে চাই, হীরু কাকে বেশী পারদর্শী করেছে। তারপর হীরুকে বললেন, তুই নায়েবকে গ্রামের সবাইকে জানিয়ে দিতে বলে লড়াইয়ের ব্যবস্থা করবি।

লড়াইয়ের দিন দুপুরের পর থেকে কাচারি বাড়ীর সামনের বিরাট মাঠে লোক ভেঙ্গে পড়তে লাগল। একদিন আগে হীরু নায়েবকে মালিকের কথা বলে ঢেঁড়া পিটিয়ে দিবার কথা বলেছিল। নায়েব তাই করেছিলেন। এর আগে ও চৌধুরী বাড়ীর কাচারির সামনে এ রকম লড়াই হয়েছে। তখন দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে লাঠিয়ালদের ও লড়াকুদের খবর দিয়ে আনা হত। আজ চৌধুরী স্টেটের ম্যানেজার ও খোদ চৌধুরী সাহেবের বডিগার্ড হীরুর ছেলে ফজুর সঙ্গে লড়াই হবে শুনে আগের থেকে এবারে বেশী লোকের সমাগম হয়েছে। তারা জানে ফজু বাঘের বাচ্চা বাঘ। আগে বাইরের লাঠিয়াল ও লড়াকুদের সঙ্গে হীরু বিজয় পুরস্কার লাভ করত। তারপর তার ছেলে ফজু সেই পুরস্কার প্রতি বছর লাভ করে আসছে। এবছর বাইরের কেউ আসেনি। শুধু ম্যানেজারের সঙ্গে ফজুর লড়াই হবে।

কাচারি বাড়ীর বারান্দায় চৌধুরী সাহেব ও গ্রামের গণ্যমান্য লোকজন বসেছেন। বেগম সাহেব দোতালার বারান্দায় চিকের আড়ালে গ্রামের অনেক মেয়েদের সঙ্গে বসেছেন।

সময় মত লড়াই শুরু হল। শাকীল ট্রাকসুট পরেছে আর ফজু হাফ প্যান্ট ও স্যান্ডো গেঞ্জী। প্রথমে লাঠিখেলা পরে তলোয়ার ও ছুরী খেলায় প্রত্যেকটায় প্রথমে দুজনে বেশ কিছুক্ষণ কেউ কাউকে হারাতে পারল না। শেষ দিকে ফজু হেরে গেল। তারপর সুটিং এ দুজনে ড করল।

চৌধুরী বাড়ীর সকলে এবং গ্রামের লোকেরা ম্যানেজার শাকীলকে একজন শিক্ষিত, ভদ্র ও ধার্মীক বলে জেনে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান করে। সকলে তার প্রশাংসায় পঞ্চমুখ। আর করবে নাই বা কেন? এই এক বছরের মধ্যে গ্রামের উন্নতির জন্য অনেক কাজ করেছে। স্কুল, মাদ্রাসা ও মসজিদে সাহায্য করেছে। রাস্তা ঘাট মেরামত করেছে। গরিবদের সুবিধে অসুবিধের খোঁজ খবর নিয়ে প্রতিকারের ব্যবস্থা করেছে। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার গুরুত্ব বুঝিয়ে তাদের গার্জেনদের সাহায্য করে স্কুল মাদ্রাসার পাঠাবার উৎসাহ দিয়েছে। ছোট বড় অনেককে নামায ধরিয়েছে। আজ তার লড়াই দেখে তাকে শ্রেষ্ঠ লড়াকু জেনে প্রশংসা করতে করতে ফিরে গেল। কিন্তু গ্রামের যারা মাস্তান ধরণের ছেলে, তাদের মনে ভীতির সঞ্চার হল। শাকীল ম্যানেজার হয়ে আসার পর তার আধিপত্য বেড়ে যেতে দেখে তারা আগে থেকে তার উপর রেগে ছিল। আজ তাকে অন্যরূপে দেখে ভাবল, একে এখন থেকে না সরাতে পারলে আমরা কোন কিছুতে সুবিধে করতে পারব না। একদিন তারা চেয়ারম্যান আমজাদ সাহেবকে তাদের মনের কথা জানাল।

শাকীল ম্যানেজার হয়ে আসার পর থেকে চেয়ারম্যানেরও ইনকাম কমে গেছে। তিনিও শাকীলের প্রতি খুব অসন্তুষ্ট। তাদের কথা শুনে বললেন, তোমরা আমার হয়ে কাজ করলে ঐ পুচকে ছোঁড়াটাকে জব্দ করতে বেগ পেতে হবে না। তোমরা এই গ্রামের ছেলে। তোমাদেরকে টপকে কোথাকার কে একটা ছোকরা মাতবরী করবে তা তোমরা সহ্য করবে কেন?

মাস্তনরা বলল, না আমরা সহ্য করবো না। এর একটা ব্যবস্থা আপনাকে করতেই হবে। আমরা আপনার সঙ্গে আছি।

চেয়ারম্যান সাহেব বললেন, ম্যানেজার চৌধুরী সাহেবের খুব পেয়ারের লোক। কাজটা খুব সাবধানে করতে হবে। চৌধুরী সাহেব জানতে পারলে কারোরই রক্ষে থাকবে না। তোমরা এখন যাও, সময় মত আমি তোমাদের ডাকবো।

চার

কয়েকদিন পর শাকীল ফজুকে সঙ্গে নিয়ে ভাগ চাষের ফসল উসুল করার জন্য কাঞ্চনপুর এল। শাকীল বিগত কয়েক বছরের ফসল উসুলের কাগজ পত্র সঙ্গে করে এনেছে। চৌধুরী সাহেবের হুকুমে গোমস্তা আসেন নি। এখানে এসে শাকীল ফজুকে নিয়ে এক গরিব কৃষকের বাড়ীতে উঠল। তার নাম সামসু।

গোমস্তার ছেলে মিনহাজ বাবার চিঠি পেয়ে সবকিছু আগেই জেনেছে। সে জানতো ম্যানেজার তাদের বাড়ীতে উঠবে। কিন্তু একজন গরিব কৃষকের বাড়ীতে উঠেছে জানতে পেরে সেখানে এসে আলাপ পরিচয় করে তাদের বাড়ীতে থাকার জন্য অনেক করে বলল।

শাকীল রাজী না হয়ে বলল, প্রয়োজন মত আপনাকে খবর দেব। আমি এখানকার মানুষদের সঙ্গে পরিচিত হতে চাই।

অগত্যা মিনহাজ বিফল মনোরথে ফিরে এল।

সামসুর একটা মাত্র ঘর। তাতেই তিন চারটে ছেলেমেয়ে নিয়ে দিন কাটায়। চৌধুরী ষ্টেটের ম্যানেজার তাদের এখানে থাকবে শুনে কি করবে না করবে ভেবে তটস্থ হয়ে উঠল।

শাকীল তাকে বলল, আপনার চিন্তা করার কিছু নেই। আমি টাকা দিচ্ছি, আপনি লোকজন নিয়ে আজই আপনার ঘরের সামনে যে খালি জায়গা রয়েছে, ওখানে একটা বেড়ার ঘর বেঁধে দিন। আমরা থাকব। আর আপনারা শুধু আমাদের খাবার ব্যবস্থা করবেন। সে জন্যেও টাকা দিচ্ছি।

সামসু কি আর করবে, ম্যানেজারের কথামত ব্যবস্থা করতে লেগে গেল।

শাকীল প্রথমে ফজুকে সঙ্গে নিয়ে দু তিন দিন সেই গ্রামের ও আশপাশের গ্রামের মানুষদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে বুঝতে পারল, এই এলাকার কিছু গরিব লোক ছাড়া প্রায় সবাই প্রতি বছর ফসলের ভাগ ঠিকমত দেয়। গোমস্তা সে সবের সিংহভাগ নিজের গোলায় তুলে বাকিটা ষ্টেটে পৌছে দেবার সময় বলে, ঐ এলাকার লোকেরা খুব গরিব। তার উপর অতি বৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির ফলে ফসল ভাল হয় না। তাই তারা ফসলের ভাগ ঠিকমত দিতে পারে না।

ফসলের উসুল নেবার জন্য শাকীলকে একমাস থাকতে হল। সে খুব গরিব ভাগ চাষির কাছ থেকে ফসলের ভাগ নিল না। অবস্থা বুঝে অনেকের কাছ থেকে কম ফসলও নিল। তারপরও যা ফসল উসুল হল, তা অন্যান্য বছরের তুলনায় তিন চার গুণ বেশী।

ফসল উসুল নেবার সময় গোমস্তার ছেলে মাঝে মাঝে সঙ্গে থাকলেও টু শব্দ করতে পারল না। লজ্জায়, দুঃশিন্তায় ও ভয়ে সে অস্থির হয়ে পড়ল। মিনহাজ বড়লোক গোমস্তার ছেলে। লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে গ্রামের কিছু উচ্ছৃঙ্খল ছেলেদের নিয়ে মাস্তানি করে বেড়ায়। ত্রিশ বত্রিশ বছর বয়স। বিয়ে করেছে। একটা ছেলে ও একটা মেয়ে। তবু মাস্তানি করে বেড়ায়। বাবার চিঠিতে সবকিছু জেনে ভেবে রেখেছিল, ম্যানেজার তাদের বাড়ীতে উঠলে খাবারের সঙ্গে বিষ দিয়ে কাজ হাসিল করবে। পরে ডোম পাড়ায় নিয়ে গিয়ে গুলি করে রটিয়ে দেবে, কে বা কারা তাদেরকে খুন করেছে। সেই প্ল্যান ভেস্তে যেতে সে তার এক বন্ধুর সাহায্যে ভিন গ্রাম থেকে লাঠাই করা বেশ কয়েকজন লেঠেল আনার ব্যবস্থা করল।

শাকীল যা ফসল উসুল করতে লাগল, তা ট্রাকে করে মেহেরপুরে পাঠিয়ে দিচ্ছে। একদিন বিকেলে শাকীল ফজুকে সাথে করে পাশের গ্রামের একজন গরিব বৃদ্ধার ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করার জন্য গিয়েছিল। কাজ সেরে ফেরার সময় পথে সন্ধ্যে হয়ে গেল। এক বাড়ীর সদরে মাগরিবের নামায পড়ে ফিরে আসতে লাগল। সেদিন ছিল পূর্ণিমা। ঐ গ্রাম ছেড়ে একটা ছোট মাঠ। মাঠটার একপাশে পোড়ো জমি। জমিটা জঙ্গলে ভর্তি। তার পাশ থেকে রাস্তা। তারা যখন সেই পেড়ো জমিটার পাশের রাস্তা দিয়ে আসছিল, তখন পনের বিশ জন লাঠিয়াল, লাঠি উচিয়ে রৈ রৈ করে ছুটে এসে তাদেরক ঘিরে ফেলল।

ফজু বিদ্যুৎ গতিতে জামার ভেতর থেকে পিস্তল বের করে এক হাতে সেটা তাদের দিকে নিশানা করে এবং অন্য হাতে লাঠি বাগিয়ে ধরে চিৎকার করে উঠল, খবরদার, ম্যানেজার সাহেবের গায়ে যদি একটা লাঠির ঘা পড়ে, তাহলে সবাইকে লাশ বানিয়ে ফেলব।

বিপদের আঁচ পেয়ে শাকীল আগেই ফজুর পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে একহাতে তাদের দিকে পিস্তল ধরে অন্যহাতে একটা বড় ছুরী ঘোরাতে শুরু করেছে।

দুজনের হাতে দুটো পিস্তল দেখে এবং শাকীলের ছুরী ঘুরানোর কায়দা দেখে লাঠিয়ালরা থমকে গেল।

শাকীল বলল, আপনারা লড়বেন, না সন্ধি করবেন? তাদেরকে চুপ করে থাকতে দেখে শাকীল আবার বলল, আমরা কিন্তু দুটোতেই রাজী। তবে সন্ধি করলে আপনাদেরই বেশী লাভ। না করলে আমরা দুজন মারা যাবার আগে আপনারা অনেকেই মারা পড়বেন। আপনারা সামান্য কয়েকটা টাকার জন্যে ছেলে মেয়েদের এতিম ও স্ত্রীদের বিধবা করতে চাইলে লড়াই শুরু করুন। আর যদি তা না চান, তা হলে আসুন আমরা একটা পরামর্শ করি। শাকীলের কথা শুনে লাঠিয়ালরা নিজেদের মধ্যে কানাকানি করতে লাগল।

তাই দেখে শাকীল আবার বলতে লাগল। আপনারা আমাদেরকে মেরে ফেললে, আমাদের মা বাবা আত্মীয় স্বজন যেমন দুঃখ পাবে। আমরা ও যদি আপনাদেরকে মেরে ফেলি, তাহলে আপনাদের মা বাবা ও আত্মীয় স্বজন তেমনি দুঃখ পাবে। আল্লাহ্ পাক কি বলেছেন আপনারা বোধ হয় জানেন না। তিনি বলেছেন, "কোন বান্দা যদি শেরেকী ছাড়া আশমান জমিন পূর্ণ গোনাহ নিয়ে আমার কাছে হাজির হয়, আমি রহমানুর রহিম, তাকে ইচ্ছা করলে মাফ করে দেব। কিন্তু সে যদি কারো মনে দুঃখ বা কষ্ট দেয়, তাহলে সেই দুঃখী লোক যতক্ষণ না তাকে মাফ করে ততক্ষণ আমিও তাকে মাফ করব না।" আপনারা নিজের ও স্ত্রী ছেলে মেয়েদের ভাত কাপড়ের জন্য আমাদেরকে হত্যা করে টাকা রোজগার করতে এসেছেন। আপনারা যদি মুসলমান হন, তাহলে নিশ্চয় জানেন, আল্লাহ্ পাক একমাত্র রেজেক দাতা। তিনি সৎ ভাবে পরিশ্রম করতে বলেছেন, রেজেক তিনি দেবেন। তিনি কোরান পাকে বলেছেন! "আমি যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রেজেক দান করি।" আরো বলেছেন, "আমি উত্তম রেজেক দাতা।" আল্লাহ'র

রসুল (দঃ) বলেছেন, " তোমরা অন্যায়ের পথে রেজেকের অনুসন্ধান করো না।" আপনারা কি ভবিষ্যৎ বংশধরদের কথা চিন্তা করেন না? হারামী রোজগারের খাবার খেয়ে যে সন্তানের জন্ম দেবেন, তারা কোন দিন ভাল হবে না। তারা ও হারামখোর হবে।

এবার ফজু বলে উঠল সাহেব, আপনি যতই ভাল কথা বলুন না কেন, ওরা শুনবে না। যা করার তাড়াতাড়ি আমাকে হুকুম দিন।

শাকীল তাকে থামিয়ে দিয়ে লাঠিয়ালদের উদ্দেশ্যে বলতে লাগল। আপনারা যার কাছ থেকে টাকা নিয়ে আমাদেরকে মেরে ফেলতে এসেছেন, এখন আমরা যদি আপনাদেরকে তার চেয়ে আরো অনেক বেশী টাকা দিই, তা হলে আপনারা কি সেই লোককে মেরে ফেলতে পারবেন? আপনারা তাতে রাজী হলে আমি টাকা দিতে প্রস্তুত। তবে একটা কথা জেনে রাখুন, আমি টাকা দিলে ও তাকে মেরে ফেলতে বলব না। কারন কোন কারণেই আমি কোনদিন কারো ক্ষতি করা তো দূরের কথা, সে কথা চিন্তাও করি না। আর একটা কথা জেনে নিন, আমি আপনাদের সকলের ভালর জন্য এসেছি। যদি কারো কোন ক্ষতি করে থাকি তাহলে আপনারা আমাকে যা খুশী করুণ, আমি বাধা দেব না। আল্লাহ্ পাক তো কাল কেয়ামতের ময়দানে ন্যায় অন্যায়ের বিচার করবেনই। শেষ কালে আর একটা কথা না বলে থাকতে পারছি না, আপনাদের হাতে আমাদের মৃত্যু যদি লেখা থাকে, তবে মরবো, নচেৎ আপনাদের মত হাজারটা লাঠিয়াল ও আমাদের কিছু করতে পারবে না।

লাঠিয়ালরা পেটের দায়ে গোমস্তার ছেলের কাছ থেকে টাকা নিয়ে এদেরকে মারতে এসেছিল। এখন শাকীলের মুখে কোরান হাদিসের কথা শুনে ও তার অমায়িক ব্যবহারে তাদের জ্ঞানের চোখ খুলে গেল। তারা তাদের সর্দার কি করে সেই আপেক্ষায় রইল। তাদের সর্দারের নাম কালু সেখ। শাকীলের কথা শুনে তার চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। সে লাঠি ফেলে দিয়ে সঙ্গিদেরকে বলল, ভাই সব আমরা এতদিন না জেনে না শুনে সামান্য কটা টাকার জন্য মানুষের উপর অন্যায়ভাবে অত্যাচার করে অনেক গোনাহ করেছি। এই সাহেবের কথা শুনে আমার জ্ঞানের চোখ খুলে গেছে। আসুন আমরা আজ উনার হাতে হাত রেখে মাফ চেয়ে ওয়াদা করি, আর জীবনে কোন দিন কোন অন্যায় কাজের জন্য লাঠি ধরব না। সর্দারের কথাশুনে সবাই লাঠি ফেলে দিল।

লাঠিয়ালদের লাঠি ফেলে দিতে দেখে শাকীল নিজের পিস্তল ও চাকু যথাস্থানে রেখে তাদের দিকে এগিয়ে গিয়ে কালু সেখকে জড়িয়ে ধরে বলল, সেই আল্লাহ পাকের দরবারে লাখ লাখ শুকরিয়া জানাই, যিনি আমার মত একজন গোনাহগার বান্দার কথায় আপনাদের জ্ঞানের চোখ খুলে দিয়েছেন। তারপর সে সকলের সঙ্গে হাত মোসাফা করতে লাগল।

কালু সেখ বলল, আপনি আমদেরকে মাফ করে দিন। আমরা জীবনে বহু গোনহ করেছি। আল্লাহ কি আমাদেরকে মাফ করবেন?

শাকীল বলল, আপনারা তো আমার কোন ক্ষতি করেন নি। আমার কাছে মাফ চাইতে হবে না। আল্লাহ পাকের কাছে মাফ চান। তিনি অসীম দয়ালু। কোন বান্দা অন্যায় করে তাঁর কাছে মাফ চাইলে, মাফ করে দেন।

কালু সেখ বলল, আমরা তাই চাইব। এখন আমাদের পরামর্শ দিন কি করবো? আপনি চলে যাবার পর গোমস্তা ও তার ছেলে আমাদের ওপর এর প্রতিশোধ নেবেন।

শাকীল বলল, উনারা যাতে সে রকম কিছু না করেন। তার ব্যবস্থা আমি করবো। এখন আপনারা আমার সঙ্গে চলুন।

শাকীল ও ফজু যখন লাঠিয়ালদের নিয়ে গোমস্তার বাড়ীর দিকে যেতে লাগল তখন গ্রামের মানুষ জানতে পেরে অবাক হয়ে তাদের সঙ্গে চলল।

গোলমাল শুনে মিনহাজ ঘরের বাইরে এসে তাদেরকে দেখে যেমন অবাক হল তেমনি খুব ভয়ও পেল। কি করবে না করবে ভেবে ঠিক করতে পারল না।

গোমস্তার ছেলেকে দেখে কালু সেখ বলল, আজ উনাদেরকে আমরা দেখে নেব। উনাদের হুকুমে অনেক অন্যায় অত্যাচার করেছি। গ্রামের লোকেরাও কালু সেখের কথার প্রতিধ্বনী করে উঠল।

শাকীল তাদেরকে থামিয়ে মিনহাজকে বলল, আপনার বাবা এক জনের চাকরি করেন। তার টাকা আত্মসাত করেছেন। গরিব চাষীদের উপর জুলুম করে টাকা পয়সা আদায় করেছেন। এ সমস্ত আপনিও নিশ্চয় জানেন। এটা ঠিক না বেঠিক কোন দিন চিন্তা করে দেখেছেন? আপনাদের কোন কর্মচারি যদি এ রকম করতো, তা হলে আপনারা তখন কি করতেন? আপনারা যে একদিন মারা যাবেন, সে কথা ও কি কোন দিন চিন্তা করে দেখেছেন? যাদের উপর অত্যাচার করছেন, তারাই তো একদিন আপনাদের

দাফন কাফন করবেন। দাফনের পর কি বলাবলি করবেন জানেন? বলবেন এই গোমস্তা ও তার ছেলে মারা গিয়ে খুব ভাল হয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে জালিমদের হাত থেকে রক্ষা করলেন। কারো মৃত্যুর পর লোকেরা যদি তার সম্বন্ধে ভাল আলোচনা করে, তাহলে আল্লাহ পাক তার আযাব অনেক লাঘব করে দেন। আর যদি তার সম্বন্ধে খারাপ আলোচনা করে, তা হলে সে আরো বেশী আযাব ভোগ করবে। আল্লাহ পাকের সৃষ্টির সেরা হয়ে যদি আমরা দুর্নিতীপরায়ন হই এবং মানুষের উপর অন্যায় অত্যাচার অবিচার করি, তা হলে আমাদের উপর কি আল্লাহ পাকের গজব নাজিল হবে না ? ধনী লোকদের ও শাসকদের জেনে রাখা উচিৎ, মজলুমের চোখের পানি আল্লাহ কবুল করে থাকেন। দুদিন অগে হোক পরে হোক তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন। প্রত্যেক মানুষের উচিৎ, নিজের ভাল মন্দের সাথে সাথে অন্যের ভালমন্দ চিন্তা করে সেই মত কাজ করা। আল্লাহ পাকের রসুল হজরত মোহম্মদ (দঃ) বলেছেন, " যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তোমরা নিজে যা পছন্দ কর, অন্যের জন্যও তা না কর ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমরা পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না।" যাই হোক এখন আপনি কি চান; আপনাকে পুলিশের হাতে তুলে দিই?

মিনহাজ এতক্ষণ শাকীলের মুখে এই সমস্ত কথা শুনে নিজের ভুল বুঝতে পেরে চোখের পানি ফেলছিল। সেই অবস্থাতে একবার সবাইয়ের দিকে চেয়ে নিয়ে বলল, আপনার কথায় আমার জ্ঞান ফিরেছে। আমি অনুতপ্ত। আমাকে মাফ করে দিন। পুলিশের হাতে না দিয়ে ভাল হবার সুযোগ দিন। এতদিন যা কিছু করেছি এবং আজকের এই ঘটনা নায়েবের হুকুমেই করেছি। কথা দিচ্ছি, কোন রকম অন্যায় কাজ আর করব না। বাবাকে ও করতে দেব না। আপনি আমাদেরকে মাফ করে দিন।

শাকীল বলল, আল্লাহ পাক সবাইকে মাফ করুন, হেদায়েৎ দান করুন। তিনি উত্তম হেদায়েৎ দানকারী । তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কেউ হেদায়েৎ পেতে পারে না। তিনি আমাদের সবাইকে হেদায়েৎ নসীব করুন। তারপর উপস্থিত সকল লোকদের উদ্দেশ্যে করে বলল, আপনারা এবার চলে যান। সবাই চলে যাবার পর শাকীল মিনহাজকে আরো অনেক কোরান হাদিসের বাণী শুনিয়ে বোঝাল। তারপর ফজুকে নিয়ে ফিরে এল।

পাঁচ

কাঞ্চনপুরের কাজ শেষ করে ফিরে এসে শাকীল চৌধুরী সাহেবকে সবকিছু জানাল।

চৌধুরী সাহেব বলেলন, গোমস্তা ও নায়েবের ব্যাপারে কিছু চিন্তা ভাবনা করেছ?

ঃ গোমস্তার ব্যাপারে চিন্তা করার বিশেষ কিছু নেই, উনাকে কয়েকদিনের জন্য বাড়ী যেতে বলুন। আশা করি ছেলের কাছ থেকে সবকিছু জেনে নিজের ভুল বুঝতে পেরে শুধরে যাবেন। তা যদি না হয় তখন তার ব্যবস্থা আমি করব। আর নায়েবকে আরো কিছুদিন সৎপথে আনার চেষ্টা করবো। এখন বয়স হয়েছে। মরনের ভয় সব মানুষেরই আছে। যদি একান্ত উনার পরিবর্তন না হয়, তখন আপনাকে জানাব।

ঃ এরকম কূটীল ও অসৎ লোকেরা কোন দিন শুধরায় না। অনেক আগেই তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতাম, বাবার আমলের বয়স্ক লোক বলে এতদিন কিছু বলি নাই।

ঃ আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় সব কিছু হয়। আমরা যে উনার সব জাল জুয়াচ্ছুরি ধরে ফেলেছি তা উনি বুঝতে পেরেছেন। এখন আমরা যদি উনাকে কিছু না বলি, তাহলে আমার মনে হয়, উনি যে রকম বুদ্ধিমান লোক, নিজেই শুধরে যাবেন। উনাকে এখন বরখাস্থ করা ও ঠিক হবে না। কারণ উনার কাছ থেকে এখানো আমার অনেক কিছু শেখার আছে।

ঃ ঠিক আছে, তুমি যা ভাল বুঝ কর।

মাস তিনেক পরে আম্মার চিঠিতে দাদীর অসুখের কথা শুনে শাকীল বাড়ী গেল। ফৌজিয়া খাতুন বার্দ্ধক্য জনিত রোগে ভুগছিলেন। শাকীল বাড়ীতে এসে ডাক্তার এনে দাদীর চিকিৎসা করিয়ে কিছুটা সুস্থা হলে প্রায় পনের দিন পরে মেহেরপুরে ফিরে এল।

বাড়ী থেকে এসে শাকীল শুনল, চৌধুরী সাহেব অসুস্থ। সেদিন রাতে খাবার সময় কাজের মেয়েকে বলল, তুমি গিয়ে চৌধুরী সাহেবকে বল, আমি উনার সঙ্গে দেখ করতে চাই।

কাজের মেয়েটা বলল, উনি আপনাকে খাওয়ার পর যেতে বলেছেন।

ঃ এতক্ষণ সে কথা বলনি কেন?

ঃ খাওয়া শেষ হলে বলতাম।

খাওয়া পর শাকীল উপরে ড্রইংরুমে গিয়ে দেখল, চৌধুরী সাহেব একটা কৌচে হেলান দিয়ে বসে গভীর চিন্তায় মগ্ন।

শাকীল সালাম জানিয়ে কুশল জিজ্ঞেস করল। চৌধুরী সাহেব সালামের জওয়াব দিয়ে সোজা হয়ে বসে বললেন, শরীর তেমন ভাল নয়। বস তোমাকে স্টেটের ব্যাপারে কয়েকটা কথা বলব। তার আগে অন্য দু একটা কথা বলে নিই। তুমি শুধু চৌধুরী বাড়ীর নয়, সমস্ত মেহেরপুরের মানুষের মধ্যে যে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিয়ে তাদের চরিত্রের আমূল পরিবর্তন সাধন করেছে তা প্রশংসার যোগ্য। সেই সব দেখে শুনে আমি ও মনের মধ্যে জ্ঞানের আলো পাবার জন্য প্রেরনা অনুভব করে তোমার রুম থেকে বিশ্ব নবী, তাজ কেরাতুল আউলিয়া, সাহাবা চরিত্র এবং কোরান হাদিসের ব্যাখ্যার বই নিয়ে এসে পড়তে থাকি। তার ফলে আল্লাহ পাকের করুণায় আমার মনে ও জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে পড়ে। গত জীবনের কৃতকর্ম স্মরণ করে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে মাফ চেয়ে তাঁর ও তাঁর রসুলের (দঃ) প্রদর্শিত পথে চলার চেষ্টা করছি। আমার মনে হয়েছে ইসলামের জ্ঞানই হল আসল জ্ঞান। স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করে সে জ্ঞান পাওয়া যায় না। যদি ও সেগুলোতে কিছু কিছু ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে, তবু ও ছেলেমেয়েরা সঠিক শিক্ষালাভ করতে পারছে না। কারন তারা যা শিক্ষালাভ করছে, তা অনুশীলন না করে শুধু ডিগ্রী নেবার জন্য। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমার এলাকার মধ্যে আমি এমন একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরী করতে চাই, যার প্রতেকটা শিক্ষক, কর্মচারী ও পরিচালকরা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের (দঃ) শিক্ষায় শিক্ষিত এবং নিজেদেরকে ন্যায় নিষ্ঠার সঙ্গে পুরোপুরি সেই মত পরিচালিত করে। আর সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছাত্রীদিগকে শিক্ষা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সেই সঙ্গে পরিচালিত করে প্রকৃত মানুষের মত মানুষ অর্থাৎ আল্লাহ পাকের খাটি বান্দা তৈরী করবে। যদি আমি তা করতে পারি, তা হলে হয়তো এর বিনিময়ে আল্লাহ পাক আমার ও আমার পূর্ব পুরুষদের গোনাহ-খাতা মাফ করতে পারেন। আমি আরো সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এই কাজের ভার তোমাকেই নেব। এখন তোমার যদি কিছু বলার থাকে, বলতে পার।

চৌধুরী সাহেবের কথা শুনে শাকীল আনন্দে আপ্লুত হয়ে আলহামদু লিল্লাহ বলে বলল, সেই আল্লাহ পাকের দরবারে শতকোটি শুকরিয়া জানাই, যিনি আমার মনের বাসনা পুরণ করার জন্য এবং তা বাস্তবায়নের জন্য আপনাকে অনুপ্রেরিত করেছেন। আমি অপনার সিদ্ধান্ত সর্বান্তকরণে সমর্থন করছি। কিন্তু এই গুরু দায়িত্ব কি আমি বহন করতে পারব?

চৌধুরী সাহেব বললেন, ইনশা আল্লাহ পারবে। তোমার মত ছেলে যদি না পারে, তবে আর কে পারবে? " কেউ ভাল কাজে অগ্রসর হলে, আল্লাহ পাক তার সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন" এটা যে হাদিসের কথা তা তুমি নিশ্চয় জান? আরো একটা সিদ্বান্তের কথা বলে এই প্রসঙ্গ শেষ করব। এখন যেভাবে তুমি এই স্টেটের সব কিছু দেখাশুনা করছ, আমার মৃত্যুর পর ও ঠিক সেই ভাবে দেখাশুনা করবে। তোমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যা কিছু করার আমি করবো।

শাকীল বলল, আপনি এতবেশী দায়িত্ব দিতে চাচ্ছেন তা পালন করতে পারব কি না জানি না, তবু কথা দিচ্ছি, আল্লাহ পাক আমাকে যতটা তওফিক দেবেন ততটা করার আপ্রাণ চেষ্টা করবো। আপনিও দোওয়া করুন, আল্লাহ পাক যেন আমাকে আপনার মনের বাসনা পূরন করার তওফিক দান করেন।

চৌধুরী সাহেব শোকর আলহামদু লিল্লাহ বলে বললেন, তাতো করবই। তোমার কথা শুনে মনে খুব শান্তি পেলাম। তারপর বললেন, কয়েক দিন আগে নায়েব আমার কাছ অন্যায় স্বীকার করে মাফ চেয়েছেন। আমি তাকে বলেছি, অতীতের অন্যায়ের জন্যে আল্লাহ পাকের কাছে মাফ চাইবেন। আর ভবিষ্যতে যে কোন অন্যায় কাজ থেকে বাঁচার জন্য তাঁর কাছেই সাহায্য চাইবেন।

শাকীল ভিজে গলায় বলল, আল্লাহ পাক কখন কাকে হেদায়েৎ করেন, তা কেউ বলতে পারে না। তাঁর পাক দরবারে আবার শুকরিয়া জানাচ্ছি। আমার দৃঢ় ধারনা ছিল, ইনশাআল্লাহ উনি নিজের ভুল বুঝতে পেরে একদিন না একদিন শুধরে যাবেন। এমন সময় বেগম সাহেবকে আসতে দেখে দাঁড়িয়ে সালাম জানিয়ে কুশল জিজ্ঞেস করল।

নাগিনা বেগম সালামের প্রতি উত্তর দিয়ে বসে তাকে ও বসতে বলে বললেন, আল্লাহ পাকের রহমতে আমি একরকম আছি। তারপর স্বামীর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললেন, কিছু দিন থেকে উনার শরীর খারাপ

যাচ্ছে। এখানকার ডাক্তাররা রোগ ধরতে পারছেন না। উনারা বলছেন, ঢাকায় কোন ভাল প্রাইভেট ক্লিনীকে একবার চেক আপ করাতে। উনি যেতে চাচ্ছেন না। তুমি যদি একবার সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে------।

চৌধুরী সাহেব স্ত্রীকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, ওসবের দরকার নেই।

শাকীল চৌধুরী সাহেবের দিকে ভাল করে লক্ষ্য করে বুঝতে পারল, চাকরি করতে এসে উনাকে প্রথমে যা দেখেছিল, তার চেয়ে অনেক শুকিয়ে গেছেন। বলল, চাচি আম্মা ঠিক কথা বলেছেন। আমি আপনাকে দু একদিনের মধ্যে ঢাকা নিয়ে যাব।

নাগিনা বেগম বললেন, তুমি তাই করো, উনার কথা শোন না।

দুদিন পর শাকীল চৌধুরী সাহেবকে নিয়ে ঢাকায় এসে একটা হোটেলে উঠতে চাইলে শাকীল সেই ব্যবস্থা করল। চাচাতো ভাই ইয়াসিন সাহেবের বাসাতে না উঠে কেন হোটেলে উঠলেন সে কথা শাকীল জানে। তাই একটা ভাল হোটেলে থেকে ইবনে সৌদ ক্লিনীকে উনার সব কিছু চেকআপ করাল। বিশেষ তেমন গুরুতর কিছু দোষ ধরা পড়ল না। ডাক্তারের প্রেসক্রীপসান মত ঔষধ পত্র কিনে শাকীল খাওয়াতে লাগল।

একদিন চৌধুরী সাহেব হোটেল থেকে ব্যারিষ্টার মুস্তাককে ফোন করে আসতে বললেন। সেদিন শাকীল চৌধুরী সাহেবকে বলে আনিসাদের বাসায় গেছে। ব্যারিষ্টার মুস্তাক অনেক দিন থেকে চৌধুরী বংশের সঙ্গে জড়িত। স্টেটের কাগজ পত্রের কাজ উনি দেখাশুনা করে আসছেন। হোটেলে এসে চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে সালাম ও কুশলাদি বিনিময় করে বললেন, কি খবর বলুন।

চৌধুরী সাহেব বললেন, শরীরটা বেশ কিছুদিন থেকে ভাল যাচ্ছে না। আপনি তো জানেন, আমার এই বিশাল স্টেটের কোন ভোগ দখলকারী নেই। ইয়াসিন থেকে ও নেই। তাকে ফিরিয়ে নেবার অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু রাজী করাতে পারিনি। শরীরের অবস্থা যে রকম, কবে কি হয়ে যায়, বলা যায় না। তাই আমি একটা উইল করতে চাই।

ব্যারিষ্টার সাহেব বললেন, উইলটা কিভাবে করবেন কিছু ঠিক করেছেন?

হ্যাঁ করেছি বলে চৌধুরী সাহেব ব্রীফকেস থেকে একটা খসড়া বের করে তার হাতে দিলেন।

ব্যারিস্টার সাহেব সেটা পড়ে খুশী হয়ে বললেন, শাকীল ছেলেটাকে দেখতে আমার খুব ইচ্ছা করছে।

চৌধুরী সাহেব বললেন, ও আমার সঙ্গে এসেছে। তার এক আত্মীকে দেখতে গেছে। কাল একবার আসুন পরিচয় করবেন। আমি উইলের ব্যাপারটা এখন কোন পক্ষকেই জানাতে চাই না। আশা করি আপনি আমার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছেন।

ব্যারিস্টার সাহেব মৃদু হেসে বললেন, বেশ তাই হবে।

চৌধুরী সাহেব তার সঙ্গে আরো কিছু গোপন আলোচনা করে আপ্যায়ন করিয়ে বিদায় দিলেন।

ঢাকায় দু সপ্তাহ থেকে শাকীল চৌধুরী সাহেবকে নিয়ে মেহেরপুর ফিরে এল। এরপর থেকে সে প্রতিদিন দুবেলা চৌধুরী সাহেবকে দেখাশুনা করতে লাগল।

একদিন চৌধুরী সাহেব শাকীলকে জিজ্ঞেস করলেন, আমার পরিকল্পনার কাজের কতদূর কি করলে?

শাকীল বলল, আপনাকে নিয়ে ঢাকায় থাকার সময় আমি কয়েকজন বিশিষ্ট আলেমের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপ করেছি। উনারা অত্যন্ত খুশী হয়ে সহযোগীতা করার আশ্বাস দিয়েছেন। এই কয়েক দিনে এখানকার আমার জানাশুনা বেশ কয়েকজন আদর্শবান শিক্ষদের সঙ্গে ও আলাপ আলোচনা করেছি। উনারা ও সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছেন। একমাস পরে বারই রবিউল আউল। ঐদিন আমি মিলাদুন্নবী উপলক্ষে এক মহফিলের আয়োজন করে ঐ সমস্ত গুণী ও সুধীজনদের নিয়ে এসে আমাদের পরিকল্পনার সবকিছু চূড়ান্ত করার কথা ভেবেছি।

চৌধুরী সাহেব বললেন, শুনে খুশী হলাম। নায়েবকে বল, উনি যেন দু একদিনের মধ্যে গ্রামের গণ্যমান্য লোকদের খবর দিয়ে কাচারি বাড়ীতে একটা মিটিং এর ব্যবস্থা করেন।

মিটিং এর দিন শাকীল চৌধুরী সাহেবের পরিকল্পনার কথা যখন বলল তখন বেশীরভাগ লোকজন আনন্দে হাত তালি দিতে লাগল। শাকীল তাদেরকে থামিয়ে দিয়ে বলল, আমরা মুসলমান। আনন্দ প্রকাশ করার রীতি আমাদের রসুল হজরত মোহম্মদ (দঃ) শিক্ষা দিয়ে গেছেন। হাত তালি দেওয়া ইসলামে নিষেধ, এটা করলে বিধর্মীদের অনুকরণ করা হয়ে যায়। আমরা মারহাবা মারহাবা বলে আনন্দ প্রকাশ করবো। কলেজ,

ইউনিভাসিটিতে পড়ছে এমন কয়েকজন ছেলে এখানে এসেছে। তাদের মধ্যে দু এক জন ছাড়া সবাই শাকীলকে মৌলবাদী বলতে ছাড়ল না। কিন্তু বেশীর ভাগ লোকজন ও ছেলেরা তাকে আদর্শবান ও ধার্মিক মনে করল।

নির্দ্দিষ্ট দিনে দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে শাকীলের আমন্ত্রণে অনেক আলেম, ওলামা, শিক্ষক, অধ্যাপক ও জ্ঞানী গুণীজন এসেছেন। শাকীল চেষ্টা চরিত্র করে শিক্ষা মন্ত্রিকে আনিয়েছেন। ইউনিয়ানের চেয়ারম্যান, কমিশনার ও মেম্বারগণ ও এসেছেন। বিভিন্ন গ্রামের লোকজনের তো কথাই নেই। তারা চৌধুরীবাড়ীতে আগে কোনদিন এরকম মহফিল হতে দেখেনি।

মাহফিলের শুরুতে সকলের অনুমতি নিয়ে শাকীল হামদ ও নাত পাঠ করার পর স্বরচিত একটা কবিতা আবৃত্তি করল।

কবিতার নাম- " জাগরে বিশ্বের মুসলিম সন্তান"

জাগরে বিশ্বের মুসলিম সন্তান,
এখানো সময় আছে
হয়ে যাও সাবধান।
জেনে নিয়ে নিজের পরিচয়
রুখে দাঁড়াও সমাজের অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে
উড়িয়ে মহা সত্যের বিজয় নিশান।

বিপথ গামীর স্রোতে ভেসে চলেছে
সারা দুনিয়ার মানব সন্তান,
তারা জানে না কোথায় তাদের ঠিকানা।
যদি তোমরা ঘুমিয়ে থাক,
তবে তাদেরকে কে রুখবে
একবার ও ভেবে দেখা কি উচিৎ না?

আল্লাহ ও তাঁর রসুলের (দঃ) বাণী
নিজেরা জেনে ও বাস্তবে মেনে চলে

তাদেরকে ফিরিয়ে আন সত্যের পথে।
তা না হলে, কাল হাশরের মাঠে
কোন মুখ নিয়ে দাঁড়াবে
সেই পরওয়ার দেগারের কাছে?

ওহে বিশ্বের মুসলিম সন্তান,
জাগো, ঘুমিয়ে থাকবে আর কতদিন?
তোমরা না শ্রেষ্ঠ জাতি আর আল্লাহ'র খলিফা?
তোমাদের উদাসীনতায় ও গাফলতিতে
ভরে গেছে দুনিয়া মোনাফেকি আর বেদাতিতে,
ঘুম থেকে জেগে হুঁশিয়ার হয়ে যাও তোমরা।

পাপের কালিমায় তাদের দীলের
ঈমানের নূর, হয়ে গেছে
অমানীশির মত তমসাছন্ন।
ইনশাআল্লাহ তোমরাই পারবে তাদের
দীলে ইমানের সেই নূর আবার জালাতে,
কেননা তোমরা তাদের ভাই, নও তো তোমরা অভিন্ন।

ওগো পীর, অলি, আওলিয়া, ফকির, দরবেশ
আর বিশ্বের আলেম ওলামাগন,
আপনাদের মোবারক কদমে আরজী জানাই-
ইবাদৎ ও জীকিরের সাথে সাথে
বিপথ গামীদের ফেরার জন্য কিছু করুণ,
নচেৎ শেষ বিচারের দিনে থাকবে না নাজাতের উপায়।

আর শুনুন কবি, লেখক ও নাট্যকারগন,
আপনারা ও লেখনী চালিয়ে যান-

শরীয়েতকে সামনে রেখে।
অশ্লীলতার কুফল আর
শ্লীলতার সুফল বর্ণনা করুন
কবিতায় নভেলে ও নাটকে।

যা পাঠ করে উৎপিড়ীত, নিস্পেসীত ও
বিপথগামী বিশ্বের মুসলিম,
পারে আবার শীর উঁচু করে দাঁড়াতে।
তা না করে সংস্কৃতির নামে
অপসাস্কৃতি সাহিত্যে ঢুকিয়ে দিলে
মুসলিম জাতি আরো যাবে রসাতলে।

ওগো প্রভূ তুমি যে করুনা সিন্ধু।
তোমার করুনা সদাই বর্ষিৎ হচ্ছে
কুল মোখলুকাতের উপর।
বিশ্বের মুসলিম আজ পেতে চায়-
সেই সিন্ধু থেকে একবিন্দু করুণা,
তুমি ছাড়া যে তাদের নেই অন্য কোন দোসর।

কবিতাটা আবৃত্তি করে শাকীল সালাম জানিয়ে বসে পড়ল। আর সমস্ত লোকজন মারহাবা মারহাবা শব্দে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলল। তারপর ওয়াজ নসীহত ও রসুলুল্লাহ'র (দঃ) জন্ম দিনের উপর বিভিন্ন বক্তাগণ বক্তব্য রাখার পর শাকীল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা ব্যক্ত করল। সকলে আনন্দের সঙ্গে সহযোগীতা করার কথা বলল। শেষে গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে একটা কমিটি গঠন করা হল। সেই কমিটির মধ্যে চৌধুরী সাহেব, শাকীল, নায়েব ও থাকলেন। চৌধুরী সাহেব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য জমি ও বিরাট অংকের টাকা ডোনেশান দিলেন। কথা হল, চৌধুরী সাহেবের টাকাতেই প্রথম যত শিঘ্রী সম্ভব কাজ শুরু হবে। পরে গ্রামের লোকজনদের কাছ থেকে টাকা পয়সা সংগ্রহ করা হবে। সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রতিষ্ঠানের নাম " চৌধুরী মেমোরিয়াল বিদ্যাপীঠ" রাখা হল।

শাকীল ষ্টেটের অফিসের সব কিছু দেখার সাথে সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরীর কাজ ও দেখাশুনা করতে লাগল। গ্রামের অনেকে শাকীলকে তার অমায়িক ব্যবহারের জন্য এবং গ্রামের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখতে দেখে আগের থেকে ভক্তি শ্রদ্ধা করত। এখন তাকে এই রকম একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পিছনে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে দেখে সেই ভক্তি শ্রদ্ধা আরো শতগুণ বেড়ে গেল। তারা বলাবলি করতে লাগল, এই ম্যানেজারের জন্যে চৌধুরী সাহেবের এবং তার আমলাদের চরিত্র পাল্টে গেছে। ক্রমশঃ তার সুনাম আশাপাশের গ্রামের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। তিন চার মাসের মধ্যে বিল্ডিং তৈরী হয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু হয়ে গেল। চালু হবার ছমাস পর হঠাৎ একদিন হার্টফেল করে চৌধুরী সাহেব মারা গেলেন।

চৌধুরী সাহেবের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে সারা গ্রামে বিষাদের ছায়া নেমে এল। উনার জানাজায় আশে পাশের ও অনেক দূর দূর গ্রামের লোকজন এসে সামিল হল। দাফন কাফনের পর সমস্ত মানুষ চোখের পানি ফেলতে ফেলতে ফিরে গেল।

সমস্ত কাজকর্ম সেরে শাকীল বেগম সাহেবের কাছে এল।

নাগিনা বেগম এতক্ষণ কেঁদে কেঁদে কিছুটা হালকা হয়েছিলেন। শাকীলকে দেখে আবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। বললেন, এই দুনিয়ায় আমার যে আর কেউ রইল না বাবা?

শাকীল উনাকে প্রবোধ দিয়ে বলল, অত ভেঙ্গে পড়বেন না চাচি আম্মা। এই পৃথিবীতে কেউ চিরকাল বেঁচে থাকে না। আল্লাহ পাক যার যতদিন হায়াৎ রেখেছেন তার একসেকেণ্ড বেশী কেউ বাঁচতে পারে না। সময় হলে আমাকে, আপনাকে, সবাইকেই এ দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে যেতে হবে। আল্লাহ পাকের কাছে সাহায্য চেয়ে সবর করুন। আপনার কেউ নেই বলছেন কেন? আপনার কোন আত্মিয় স্বজন না থাকতে পারে, আমি তো আছি। সর্বোপরী আল্লাহ পাক আছেন। তিনি যেমন সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা তেমনি পালন কর্তা। আমাকে ছেলে মনে করে দীলে তাসাল্লী দিন। ইনশা আল্লাহ আমার শরীরে একবিন্দু রক্ত থাকতে আপনার কোন রকম কষ্ট

হতে দেব না। তারপর উনার পায়ে হাত দিয়ে বলল, বলুন, আমাকে ছেলে বলে গ্রহণ করলেন?

নাগিনা বেগম শাকীলের মাথায় চুমো খেয়ে বললেন, হ্যাঁ বাবা, তুমি ঠিক কথা বলেছ। এতদিন তোমাকে ছেলের মত মনে করতাম, আজ থেকে তুমি আমার পেটের ছেলে।

শাকীল আম্মা বলে উনার দুপা জড়িয়ে ধরল।

নাগিনা বেগম চির আকাংখিত আম্মা ডাক শুনে শাকীলের মাথা বুকে চেপে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বললেন, আর একবার আম্মা বলে ডাক বাবা।

শাকীল আম্মা বলে ডেকে বলল, আপনি এবার চুপ করুন আম্মা, আজ থেকে আমিও আপনাকে গর্ভধারীনী মা মনে করবো।

চৌধুরী সাহেবের কুলখানি করার পর শাকীল নাগিনা বেগমের অনুমতি নিয়ে নায়েবকে বলে এবারে প্রায় চার মাস পরে বাড়ী এল। সে আগেই পত্র দিয়ে বাড়ীতে চৌধুরী সাহেবের মৃত্যু সংবাদ দিয়েছে। রাত্রে খাওয়ার পর শাকীল দাদীর হাতে পায়ে তেল মালিশ করে দিচ্ছিল। ফোজিয়া খাতুন বললেন, তেল মালিশ করতে হবে না, শুতে যা।

ঃ কেন দাদী আমি কি দোষ করলাম?

ঃ ন মাসে ছ মাসে বাড়ীতে এসে দু একদিন তেল মালিশ করিস। বাকি দিনগুলোতে কে করে খোঁজ করেছিস?

ঃ আম্মা নিশ্চয় করে। আমি ঘরে থাকলে প্রতিদিন করে দিতাম।

ঃ তুই না থাকলে ও আর একজনকে এনে দিতে পারিস না? আম্মা সারাদিন সংসারের হাল ঠেলবে না আমাকে দেখবে। আমি তাকে তেল মালিস করতে নিষেধ করে দিয়েছি। তোকে ও করছি।

শাকীল দাদীর মনোভাব বুঝতে পেরে বলল, আপনি আনার ব্যবস্থা করুন।

ঃ আমি বুড়ী হয়ে গেছি, কি করে করবো? তোর আম্মা ও বেশী চলা ফেরা করতে পারে না। তুই নিজে দেখে শুনে করতে পারিস না?

ঃ আমি দেখে শুনে করলে সে তো আপনার হাতে পায়ে তেল মালিশ করে দেবে না। আজকালকার শিক্ষিত আপটুডেট মেয়েরা এসব কাজ করবে না।

ঃ করবে করবে। তুই সে রকম মেয়ে আনবি কেন?

ঃ আপনার মনের মত মেয়ে কি খুঁজে পাব? না এ যুগে পাওয়া যাবে?

তাই বলছিলাম, আপনি কাউকে দিয়ে খোঁজ খবর নিয়ে দেখুন। যদি সেরকম মেয়ে পাওয়া যায়, তাহলে তাকে নাতবৌ করার ব্যবস্থা করুণ।

এতক্ষণ সুরাইয়া খাতুন সবাইকে খাইয়ে তারপর নিজে খেয়ে সবকিছু গোছগাছ করে সেখানে এসে বললেন, দাদী নাতীতে কি এত কথা হচ্ছে?

শাকীল জানে দাদী তার বিয়ের কথা বলবে, তাই সে ঘুমোতে যাই বলে নিজের রুমে চলে এল।

ফৌজিয়া খাতুন বৌকে বললেন, বৌমা তোমরা এবার শাকীলের বিয়ের ব্যবস্থা কর। ওর বিয়ের বয়স হয়েছে। তুমি আর কতদিন সংসার টানবে।

সুরাইয়া খাতুন বললেন, আপনার ছেলে, মেয়ের খোঁজ করছে। কয়েকজনকে বলেও রেখেছে। আল্লাহ পাক রাজী থাকলে এ বছর ওর বিয়ের ব্যবস্থা করবো।

শাকীল নিজের রুমে এসে শুয়ে শুয়ে বিয়ের কথা ভাবতে গিয়ে শাকিলার কথা মনে পড়ল। মেয়েটাকে তার খুব পছন্দ। তার দেওয়া ঠিকানা পড়ে যখন সে জানতে পারল, শাকিলা আব্বার বন্ধুর মেয়ে এবং আব্বার বন্ধু ও মেয়েকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, তখন থেকে শাকিলাকে ভুলে যাবা চেষ্টা করেছে। কারণ আব্বা আম্মার কথায় সে বুঝতে পেরেছিল, ঐ মেয়েকে তারা বৌ করবে না। কিন্তু মাঝে মাঝে শাকিলার ছবি তার মনের পাতায় ভেসে উঠে। তাই আজ ও দাদী বিয়ের কথা তুলতে তার কথা মনে পড়ল। যতবার শাকীল ঢাকায় গেছে ততবার শাকিলাদের বাসায় যেতে তার মন চেয়েছে। আব্বা আম্মার অনিহা জেনেও সে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু শিশু একাডেমীর গেটে অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটে যাবার পর আর যাই নি। ভাবল, এতদিনে হয়তো তার বিয়ে হয়ে গেছে।

ছয়

চৌধুরী সাহেব মারা যাবার তিনমাস পর ব্যারিষ্টার মোস্তাক একদিন ইয়াসিন সাহেবের বাসায় এলেন। ইয়াসিন সাহেব যখন ঢাকায় জায়গা কিনেছিলেন তখন ঐ জায়গাব আংশীদাররা মামলা করেছিল। সেই সময় ব্যারিষ্টার মোস্তাক ইয়াসিন সাহেবের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেছিলেন। তখন তিনি জানতে পারেন, ইয়াসিন সাহেব মেহেরপুরের চৌধুরী বংশের ছেলে। তারপর উভয়ে উভয়ের পরিচয় পেয়ে কাছাকাছি এসে যান। ইয়াসিন সাহেব বাসাতে ছিলেন। সালাম ও কুশলাদির পর আপ্যায়নের সময় ব্যারিষ্টার মোস্তাক বললেন, আপনার মেয়েকে ডাকুন দরকার আছে।

ইয়াসিন সাহেব একটা কাজের মেয়েকে শাকিলাকে ডেকে দিতে বলে একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার বলুন তো?

ব্যারিস্টার মোস্তাক বললেন, ব্যাপার কিছু একটা আছে। মেয়ে এলেই বুঝতে পারবেন।

শাকিলা এসে ব্যারিস্টার মোস্তাককে সালাম দিয়ে বলল, কেমন আছেন চাচা?

ব্যারিস্টার মোস্তাক বললেন, ভাল আছি মা, তুমি বস। তারপর ব্রীফকেস খুলে একটা দলীল বের করে শাকীলার হাতে দিয়ে বললেন, তোমার চাচা, মানে মেহেরুপুরের চৌধুরী স্টেটের মালিক মেসবাহ উদ্দিন মাস তিনেক আগে মারা গেছেন। সে খবর তোমরা নিশ্চয় জেনেছ। উনি মারা যাবার প্রায় বছর খানেক আগে আমাকে দিয়ে এই উইল করিয়েছিলেন। তখন বলেছিলেন, উনার মৃত্যুর পর আমি যেন এটা তোমার কাছে পৌঁছে দিই। আমি উনার মৃত্যুর খবর পেয়ে মেহেরপুরে গিয়েছিলাম। এই উইলের আর একটা কপি, বর্তমানে চৌধুরী স্টেটের যিনি ম্যানেজার তাকে দিয়ে এসেছি। চৌধুরী সাহেব সেই সময় এই উইলের কথা গোপন রাখতে বলেছিলেন। এগুলো আমানত হিসাবে আমি এতদিন রেখেছিলাম। এখন সেই আমানত তোমাদের হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম।

শাকিলা উইলটা পড়তে শুরু করল–

আমি, মেসবাহ উদ্দিন চৌধুরী পিতা মরহুম আঃ বাসেত চৌধুরী, জিলা মেহেরপুর, নিঃসন্তান হওয়ায় আমার মৃত্যুর পর এই চৌধুরী স্টেটের সমস্ত

সম্পত্তি থেকে আমার স্ত্রী নাগিনা বেগম ইসলামিক শরামুতে যা পাবে তা বাদে এক তৃতীয় অংশ চৌধুরী মেমোরিয়াল বিদ্যাপীঠের নামে দান করে গেলাম। অবশিষ্ট অংশ, ঢাকায় বসবাসকারী আমার চাচাতো ভাই ইয়াসিনের মেয়ে শাকিলাকে নিম্নলিখিত শর্তে উত্তরাধিকারী করলাম।

(১) আমার স্টেটের ম্যানেজার কুষ্টিয়া নিবাসী রেদওয়ান আহম্মদের পুত্র শাকীল আহম্মদকে বিয়ে করবে, এবং সেই বিয়ে এক বছর টিকে থাকতে হবে।

(২) যদি শাকিলা শাকীলকে বিয়ে না করে অথবা বিয়ে করলে ও তা এক বছর না টিকে তা হলে শাকিলা এই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারবে না। তখন স্টেটের ম্যানেজার শাকীল আহম্মদ এই সম্পত্তির অর্দ্ধেক পাবে, আর বাকি অর্দ্ধেক তারই তত্ত্বাবধানে থাকবে। ঐ অর্দ্ধেক সম্পত্তির আয় সে জনগণের কল্যাণের জন্য ব্যয় করবে। এ ব্যাপারে তাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হল।

এই উইল আমি সুস্থ্য অবস্থায় অনেক চিন্তা ভাবনা করে ব্যারিষ্টার মোস্তাককে দিয়ে করালাম। কারো ভয় ভীতি বা প্ররোচনায় করিনি। আমার মৃত্যুর পর কেউ যদি এই সম্পত্তিতে দাবী করে, তা আইনগতঃ বাতিল বলে গণ্য হবে।

মেসবাহ উদ্দিন চৌধুরী,
মেহেরপুর
তারিখ.....

উইলটা পড়া শেষ করে শাকিলা খুব অবাক হয়ে বাবার হাতে দিল।

চাচাতো ভাই মেসবাহ উদ্দিনের মৃত্যু সংবাদ নায়েবের পত্রে ইয়াসিন সাহেব জেনেছিলেন। এখন উনার উইল পড়ে চোখের পানি রোধ করতে পারলেন না। চোখ মুছে ব্যারিষ্টার মোস্তাককে বিদায় দিয়ে উইলটা আর একবার পড়লেন। তারপর মেয়ের হাতে ফেরৎ দেবার সময় বললেন, আল্লাহ পাকের কুদরত বোঝা মানুষের অসাধ্য। যিনি আমাকে দাদার কোলে এতিম করে যে সম্পত্তি থেকে নামোহরুম করলেন, আবার তিনিই সেই সম্পত্তির উত্তরনাধিকারী আমার মেয়েকে করার ব্যবস্থা করলেন। বন্ধুর ছেলের সঙ্গে শাকিলার বিয়ের কথা উইলে শর্ত আছে জেনে খুশী হয়েছেন। বললেন, তোর চাচা ঠিক রত্নই চিনেছিল। শাকীল যদি তার বাবার চরিত্রের

শত অংশের এক অংশ পাই, তাহলে তোর জীবন ধন্য হয়ে যাবে। আল্লাহ পাক তোর তকদ্বীরে এই সব লিখে রেখেছেন বলে তোর বিয়ে ভেঙ্গে গেল।

শাকিলা উইলে শাকীলের নাম ধাম জেনে সন্দেহের দোলায় দুলতে লাগল। ভাবল, ষ্টেডিয়ামে যার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, তার নাম ও শাকীল এবং তার বাড়ী ও কুষ্টিয়ায়। যদি সে হয়, তাহলে সেই চরিত্রহীন লম্পটকে সে কিছুতেই বিয়ে করবে না। আর যদি তা না হয়, তা হলে যে ছেলের কথা বাবা বলল, তাতে ভালই হবে। বাবাকে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা তুমি তো বলেছিলে তোমার বন্ধুর ছেলে স্কুল মাষ্টারী করে।

ইয়াসিন সাহেব বললেন, তখন হয়তো করতে। পরে মেহেরুপুরে স্টেটের ম্যানেজারি করছে।

ঃ তুমি কি উইলের ব্যাপারে কিছু ভাবছ?

ঃ আমি কি ভাববো? যা কিছু তোকে ভাবতে হবে।

ঃ আমি একবার মেহেরপুর যাব।

ঃ বেশ তো যা। কবে যাবি আমাকে বলিস, আমি যাবার ব্যবস্থা করে দেব।

বিয়ে ভেঙ্গে যাবার পর শাকিলা এম,এ, পড়ছে। বলল, কয়েক দিনের মধ্যে ভার্সিটি বন্ধ পড়বে। সেই সময় যাব।

ইয়াসিন সহেব একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তাই যাস।

শাকিলা বাবাকে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে দেখে বলল, তুমি যেন কিছু চিন্তা করছ?

ঃ কি আর চিন্তা করব মা, তোর চাচা খুব বুদ্ধিমান লোক ছিল। তাই বুদ্ধি করে আমার বন্ধুর ছেলেকে ম্যানেজার করেছে, এবং তোকে তার সঙ্গে বিয়ে দেবে বলে এই উইল করে গেছে। ছেলেটাকে আমি একবার মাত্র দেখেছি, এবং তার সঙ্গে দু একটা কথাও বলেছি। তাতেই বুঝেছি, ছেলেটা বাপের উপযুক্ত ছেলে। এ যুগে এরকম ছেলে হয় না।

ঃ বাবা তুমি যে তোমার বন্ধুর ও তার ছেলের এত গুণাগুণ করছ, কিন্তু তুমি ও আমার সেই বিয়ে ভেঙ্গে যাবার দিন ছাড়া আগে তো তাদের কথা কখনো তোমার মুখে উচ্চারণ করতে শুনিনি।

ঃ বন্ধুর কথা মুখে উচ্চারণ করিনি ঠিক। কিন্তু মনে মনে তার কথা ভাবতাম। সে আমার বিপদের সময় যা উপকার করেছিল, তার ঋণ

কোনদিন শোধ করতে পারব না। তুই তো সব কথা জানিস না। যে দিন চৌধুরী বাড়ী থেকে তোর দাদীকে নিয়ে চলে আসি, সেদিন ঐ বন্ধু তার বাড়ীতে আশ্রয় দিয়েছিল। তারপর সেখানে বাড়ী ঘর ও জায়গা জমি করার পিছনে তার দান কোন দিন ভুলতে পারব না। সেই সব দিনের কথা মনে হলে, মনের মধ্যে যে কি হয় তা আল্লাহ পাক জানেন।

ঃ উনি যদি আপনার এতবড় বন্ধু, তা হলে এতদিন যোগাযোগ রাখনি কেন?

ইয়াসিন সাহেব আবার একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, একটা খুব বেদনা দায়ক ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমাদের দুজনের সম্পর্ক বন্ধ হয়ে যায়। আর সেই বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটেছে আমারাই জন্য। তার কোন দোষ নেই মা। সে কোন দিন কোন দোষ করতে পারে না। এর বেশী কিছু তোকে বলতে পারব না। তুই আর কোন প্রশ্ন করিসনি।

বাবার কথাগুলো শাকিলার কানে কান্নার মত শোনাল, বলল, ঠিক আছে বাবা, আর কিছু জিজ্ঞেস করবো না।

ব্যারিষ্টার মুস্তাক মেহেরপুরে গিয়ে চৌধুরী বাড়ীর কাচারিতে যখন উইলটা সকলের সামনে পড়ে শুনিয়ে শাকীলের হাতে দিলেন, তখন সবাই অবাক হয়ে গেল।

চৌধুরী সাহেব তাকে এত আপন করে নিয়েছিলেন ভেবে শাকীলের চোখ দুটো পানিতে ভরে উঠল। মনে মনে আল্লাহ পাকের কাছে তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করতে করতে ব্যারিষ্টার সাহেবকে আপ্যায়ন করিয়ে বিদায় দিল। তারপর উইলটা নিয়ে বেগম সাহেবের কাছে গিয়ে উনার হাতে দেবার সময় বলল, এটা আপনি রেখে দিন।

নাগিনা বেগম উইল পড়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে বললেন, এটা তো তোমার জিনিস, আমাকে দিচ্ছ কেন?

ঃ আমার হলে ও চৌধুরী বাড়ীর ইজ্জাৎ এটার উপর নির্ভর করছে। আমি সামান্য স্কুল মাস্টারের ছেলে। আমি কি চৌধুরী বাড়ীর ইজ্জৎ বাচাতে পারব? এমনি উনি যে দায়িত্ব আমার ঘাড়ে দিয়ে গেছেন, তা কতটুকু সমালাতে পারব জানি না। তার উপর যদি এই দায়িত্ব চাপে, তা হলে কি করে কি করবো?

ঃ দেখ শাকীল, তুমি যখন আমাকে আম্মা বলে ডেকেছ, তখন আমার কথা শোন। তোমার চাচাজান তোমাকে নিজের ছেলের মত

করতেন বলে এতকিছু দায়িত্ব তিনি তোমার ঘাড়ে দিয়ে গেছেন। এখন তোমাকেই সেই সব দায়িত্ব পালন করতে হবে। তানা হলে উনার মত আমিও শান্তি পাব না।

শাকীল নাগিনা বেগমকে কদমবুসি করে বলল, ঠিক আছে, আমি আপনার কথা মেনে নিলাম। দোওয়া করুন, আল্লাহ পাক যেন আমাকে সব দায়িত্ব পালন করার শক্তি দেন। আর উইলটা ছেলে হয়ে আম্মার কাছে গচ্ছিত রাখলাম।

নাগিনা বেগম দোওয়া করে বললেন, বেশ তাই থাক।

শাকীল নাগিনা বেগমের কাছ থেকে নিজের রুমে এসে চিন্তা করতে লাগল, শাকিলা উইলে বিয়ের শর্তের কথা জেনে কি করবে? আমাকে চরিত্রহীন জেনে নিশ্চয় বিয়ে করতে রাজী হবে না। কিন্তু বিয়ে না করলে তো সে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে। শেষে ভেবে ঠিক করল, যদি একান্ত সে বিয়ে করতে রাজী না হয়, তাহলে যা করার আমাকেই করতে হবে।

ভার্সিটি বন্ধ পড়তে শাকিলা একদিন বাবাকে বলল, আমি মেহেরপুর যাব।

ইয়াসিন সাহেব বললেন, নায়েবকে চিঠি দিয়ে আনাই তার সঙ্গে যাবি।

ঃ না তাদের কাউকে জানাবার দরকার নেই। আমি গাড়ী নিয়ে ড্রাইভারের সাথে একা যাব।

ঃ তাকি করে হয়? অত দূরের রাস্তা, তাছাড়া তোকে সেখানকার কেউ চিনে না।

ঃ না চিনুক, তবু কাউকে জানাবার দরকার নেই।

ইয়াসিন সাহেব একমাত্র মেয়ের জিদ জানেন। বললেন, তুই যখন আমার কথা শুনবি না তখন যা বুঝিস কর।

পরের দিন শাকিলা ড্রাইভারকে নিয়ে গাড়ী করে মেহেরপুরে কাচারি বাড়ীতে এসে যখন পৌছাল তখন বিকেল পাঁচটা।

দারোয়ানের মুখে খবর পেয়ে নায়েব বেরিয়ে এসে অভ্যর্থনা করে কাচারি বাড়ীতে এনে বসালে। তারপর বেগম সাহেবের কাছে খবর পাঠাল।

নাগিনা বেগম একজন কাজের মেয়েকে পাঠিয়ে শাকিলাকে নিয়ে এলেন। আর নায়েবকে বলে পাঠালেন, ড্রাইভারের থাকার ব্যবস্থা করতে।

শাকিলা নাগিনা বেগমকে কখনো দেখে নি। তাই চিনতে না পারলে ও অনুমানের উপর নির্ভর করে প্রথমে কদমবুসি করল। তারপর জিজ্ঞেস করল, কেমন আছেন চাচি আম্মা?

নাগিনা বেগম তার মাথায় চুমো খেয়ে দোওয়া করে জড়িয়ে ধরে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বললেন, আল্লাহ পাক যে অবস্থায় রেখেছেন, সেই অবস্থায় আছি। তোমার চাচা বেঁচে থাকতে যদি আসতে মা, তাহলে তিনি কত খুশী হতেন। তারপর চোখ মুছে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার আব্বা আম্মা ভাল আছে?

ঃ জী ভাল আছে।

নাগিনা বেগম তাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, কাপড় পাল্টে হাত মুখ ধুয়ে এস, নাস্তা করবে।

শাকিলা আসার তিনচার দিন আগে শাকীল এক সপ্তাহের জন্য বাড়ী এসেছে। বাড়ীতে আসার পরের দিন আব্বা আম্মাকে উইলের কথা জানাল।

রেদওয়ান শুনে কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আল্লাহ পাকের কাজ মানুষের বোঝা আসাধ্য।

উইলের কথা শুনে সুরাইয়া খাতুনের ইয়াসিনের প্রতি প্রতিহিংসার আগুণ জ্বলে উঠল। স্বামীকে বলল, ইয়াসিনের মেয়ের সঙ্গে শাকীলের বিয়ে আমি কিছুতেই হতে দেব না। তুমি তাড়াতাড়ি মেয়ে দেখ। আমি ওর বিয়ে দেব। কতদিন থেকে তোমাকে মেয়ে দেখতে বলছি, তুমি কোন গা করছ না।

শাকীল মাকে রেগে যেতে দেখে ও বিয়ের কথা শুনে সেখানে থেকে নিজের রুমে চলে এল।

ফৌজিয়া খাতুন বৌয়ের বড় গলার আওয়াজ পেয়ে সেখানে এসে বললেন, কি হয়েছে বৌমা? এতজোরে কথা বলছ কেন? তোমাকে না কত দিন বলেছি, মেয়েদের বড় গলায় কথা বলতে আল্লাহ ও তাঁর রসুল (দঃ) নিষেধ করেছেন?

সুরাইয়া খাতুন লজ্জা পেয়ে বললেন, আমার ভুল হয়ে গেছে আম্মা, আল্লাহ আমাকে মাফ করুণ। আসুন খাটে আপনার ছেলের কাছে বসুন।

ফৌজিয়া খাতুন ছেলের পাশে বসে বললেন, তুই আবার বৌমাকে কি বললি যে, সে রেগে গেল।

রেদওয়ান বললেন, আমি কিছু বলিনি। তারপর উইলের কথা শুনিয়ে বললেন, এই জন্যে তোমার বৌমা রেগে গেছে।

ফৌজিয়া খাতুন বুঝতে পেরে কিছুক্ষন চুপ করে থেকে বৌকে বললেন, তুমি শিক্ষিত মেয়ে। তোমার পেটে আল্লাহ'র এলেম ও আছে। তুমি কি জান না, অপরাধীকে ক্ষমা করা মহৎ কাজ। আর যে অনুতপ্ত অপরাধীকে ক্ষমা করে, তাকে আল্লাহ ও তাঁর রসুল (দঃ) ভালবাসেন। আগেকার সবকিছু ভুলে এখন কি করা যায়, সে কথা চিন্ত কর। যদি তুমি ইয়াসিনের মেয়েকে বৌ করতে না চাও, তাহলে সবাই বলবে, চৌধুরী স্টেটের সম্পত্তির লোভে আমরা তা করছি না।

শাশুড়ীর কথা শুনে সুরাইয়া খাতুন নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। বললেন, আমার অন্যায় হয়েছে আম্মা। কিন্তু আমরা ছেলের পক্ষ হয়ে আগে বেড়ে কিছু করতে যাব না। মেয়ের বাবাকে এগিয়ে আসতে হবে।

ফৌজিয়া খাতুন বললেন, তাতো বটেই। আমার দাদুর মত ছেলে তারা পাবে কোথায়? এ যুগে লাখে একটা এমন ছেলে আছে কিনা সন্দেহ। আল্লাহ পাকের যা মর্জি তাই হবে। তাকে রোধ করার ক্ষমতা কারো নেই। তারপর তিনি শাকীলের রুমে গিয়ে তার পাশে বললেন, দাদু ভাই, তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো, ঠিক উত্তর দিবি তো?

ঃ আমাকে কোন দিন মিথ্যে বলতে শুনেছেন?

ঃ না তা শুনিনি। তবে কি জানিস ভাই, বিয়ে সাদির ব্যাপারে অনেকে দুষ্টুমী করে অথবা লজ্জায় একটু আধটু মিথ্যে বলে, তাই বললাম।

ঃ আমি তাও বলব না। কি জিজ্ঞেস করবেন করুন।

ঃ ঐ মেয়েকে কি তুই দেখেছিস?

ঃ দেখেছি।

ঃ পছন্দ হয়?

ঃ হয়।

ঃ ওরে দুষ্ট, তা হলে আগের থেকে ডুবে ডুবে পানি খাচ্ছিস।

ঃ না খাইনি। কারণ প্রায় বছর দুই আগে হাঠাৎ একবার মাত্র তার সঙ্গে ঢাকা স্টেডিয়ামে বল খেলা দেখতে গিয়ে পরিচয় হয়েছিল। তবে তখন জানতাম না, সে আব্বার বন্ধুর মেয়ে। সে যখন ঠিকানা দিয়ে একদিন তাদের

বাসায় যেতে বলল, তখন ঠিকানা পড়ে জানতে পারি। আর সে এখনো বোধ হয় জানে না আমি তার বাবার বন্ধুর ছেলে।

ঃ আচ্ছা তাই নাকি? তারপর তাহলে আর দেখা সাক্ষাৎ হয় নি?

ঃ না।

ঃ তা নাই হোক। তাকে যখন তোর পছন্দ তখন আর বাধা কোথায়? রেদওয়ানকে বলি, শুভ কাজ তাড়াতাড়ি যাতে হয়, সেই ব্যবস্থা করতে।

ঃ না দাদী, এখন আব্বাকে কিছু বলবেন না।

ঃ কেন?

ঃ কারণ আছে।

ঃ কারণটা বল না শুনি।

ঃ এখন বলতে পারব না।

ঃ কখন বলতে পারবি?

ঃ আপনি দেখছি উকিলি জেরা শুরু করেছেন। তারপর গলা নামিয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, দাদাকে বুঝি সব সময় এরকম উকিলি জেরা করতেন?

ঃ ওরে শালা, কথাটা ঘোরাবার চেষ্টা করছিস। বুড়ী হয়ে গেছি বলে, বোকা মনে করছিস না? ওসব চালাকি আমার কাছে খাটবে না। কারণটা না শুনে ছাড়ছি না।

ঃ আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছায় যেদিন ঐ মেয়েটাকে আপনার নাত বৌ করে আনবো, সেদিন তার সামনে কারণটা বলবো। এখন বলতে পারব না। বেয়াদবি মাফ করবেন।

ফৌজিয়া খাতুন নাতির না বলার কারণটা ঠিক বুঝতে না পারলে ও এটা ঠিক বুঝলেন, মেয়েটাকে বিয়ে করতে তার আপত্তি নেই। বললেন, একান্ত যখন বলবি না, তখন আর কি করা যাবে? নাত বৌয়ের অপেক্ষাতেই থাকি।

শাকীল এক সপ্তাহ বাড়ীতে থেকে মেহেরপুর রওনা হল। বাস স্ট্যাণ্ডে নেমে আসরের নামাজ পড়ে একটা রিক্সা করে শাকীল আসছিল। গ্রামের বিলের পাড়ের রাস্তা দিয়ে আসবার সময় একটা প্রাইভেটকার রাস্তা বন্ধ করে রয়েছে দেখে রিক্সাওয়ালা বলল, কি করে যাব সাহেব?

শাকীল গাড়ীতে কাউকে দেখতে না পেয়ে চারপাশে তাকাতে গিয়ে অল্প কিছু দূরে বাগান বাড়ীতে নায়েবের সঙ্গে একজন বয়স্ক লোক ও একজন সালওয়ার কামিজ পরা যুবতী মেয়েকে দেখতে পেল।

রিক্সার বেলের আওয়াজ শুনে নায়েব সেদিকে তাকিয়ে শাকীলকে দেখতে পেলেন। তারপর শাকিলার দিকে চেয়ে বললেন, ম্যানেজার সাহেব এসে পড়েছেন। চলুন ফেরা যাক। আমারা রাস্তা বন্ধ করে এসেছি।

তারা কাছাকাছি এলে শাকীল রিক্সা থেকে নেমে সালাম দিয়ে বলল, নায়েব চাচা কেমন আছেন? আপনাদের সব খবর ভাল?

নায়েব সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, হ্যাঁ বাবা আমরা সবাই ভাল আছি। আপনাদের বাড়ীর খবর ভাল?

ঃ জী ভাল। তারপর শাকিলার দিকে চেয়ে চিনতে পেরে ও জিজ্ঞেস করল, উনারা?

ঃ শাকিলাকে দেখিয়ে বললেন, ইনি চৌধুরী সাহেবের চাচাতো ভাইয়ের মেয়ে, ঢাকায় থাকেন। তিন চারদিন হল এসেছেন। আর লোকটিকে দেখিয়ে বললেন, ড্রাইভার।

শাকীল শাকিলার দিকে চেয়ে লক্ষ্য করল, দু বছর আগের থেকে সে অনেক স্বাস্থ্যবতী ও সুন্দরী হয়েছে। মুখের দিকে চাইতে গিয়ে চোখে চোখ পড়ল। শাকীল তার চোখে রাগ ও ঘৃণা দেখতে পেল। দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে নায়েবকে বলল, আপনারা গাড়ীতে করে যান, আমি রিক্সায় আসছি।

শাকিলা তাকে চিনতে পেরে ভাবল, আমি যা অনুমান করেছিলাম, তাই ঠিক হল। মনে মনে শাকীলের প্রতি খুব রাগ ও ঘৃণা হতে লাগল। তার কথা শুনে ড্রাইভারকে বলল, তুমি নায়েব চাচাকে নিয়ে যাও, আমরা এটুকু পথ হেঁটে যাব।

শাকিলার কথা শুনে শাকীল রিক্সাওয়ালাকে ভাড়া দিয়ে বিদায় দিল।

নায়েব গাড়ীতে করে চলে যাবার পর শাকিলা শাকীলকে জিজ্ঞেস করল, আমাকে না চেনার ভান করলেন কেন? এরকম করেই কি সবাইকে ঠকিয়ে চলেছেন?

শাকীল বিদ্রুপটা গায়ে নিল না। মৃদু হেসে বলল, দুনিয়াটা এত কঠিন পরীক্ষার জায়গা যে, মাঝে মাঝে এরকম না করলে পাশ করা যায় না। কুরআন এর মধ্যে একটা কথা আছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখে যারা সব কিছু

বচার করে, তাদের বিচার সব সময় খাঁটি হয় না। আর সমাজে অহরহ যা টছে তার কারণ অনুসন্ধান না করে আমরা অনেক ক্ষেত্রে ভুল করি। ওসব কথা থাক; রাস্তায় দাঁড়িয়ে এসব আলোচনা করা যায় না। চলুন এগোনা যাক বলে সে হাঁটতে আরম্ভ করল।

গ্রামের ভিতরে আসতে রাস্তার দুপাশের বাড়ী ঘর থেকে ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে এসে শাকীলকে সালাম দিতে লাগল। আর বড়রা সালাম দিয়ে হাত মোসাফা করে ভালমন্দ জিজ্ঞেস করতে লাগল। বাড়ীর বৌ ঝিরা দরজা জানালা থেকে শাকীলকে এক নজর দেখার জন্যে ভীড় করছে। যেতে যেতে শাকীল হাসি মুখে তাদের ভালমান্দ জিজ্ঞেস করছে। অনেকে তাদের সমস্যার কথা জানাচ্ছে। তাদেরকে সে কাচারিতে দেখা করতে বলছে। একটা ছয় সাত বছরের মেয়ে ছেঁড়া হাফ প্যান্ট পরে খালি গায়ে শাকীলের সামনে এসে বলল, আব্বার অসুখ আবার বেড়েছে, আব্বা আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছিল। আপনি দেশে গেছেন শুনে ফিরে এসেছি।

শাকীল তার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে তার হাতে পঞ্চাশ টাকার একটা নোট দিয়ে বলল, এটা তোমার আব্বাকে দিয়ে বলো, আমি পরে আসবো। কাচারি বাড়ীর গেটের কাছে এসে মাগরিবের আযান শুনে শাকিলাকে বলল, কিছু মনে করবেন না, আমার সঙ্গে হেঁটে এসে অনেক কষ্ট পেলেন। আপনি ভিতরে যান, আমি মসজিদ থেকে নামায পড়ে আসছি। তারপর দারোয়ানের সঙ্গে সালাম বিনিময় করে ব্রীফকেসটা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে মসজিদের দিকে চলে গেল।

শাকিলাকে ম্যানেজারের দিকে চেয়ে থাকতে দেখে দারোয়ান বলল, আপনি ভিতরে যান, আমিও নামায পড়বো। তাকে তার মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকতে দেখে আবার বলল, ম্যানেজার সাহেব আসার পর শুধু চৌধুরী বাড়ীতে নয়, সারা মেহেরপুরে কেউ বেনামাযি আছে কিনা সন্দেহ।

শাকিলা ভিতরে আসার সময় চিন্তা করল, শাকীল কি সত্যিই ভাল ছেলে? না শঠ? এগুলো কি তার চরিত্রের বৈশিষ্ঠ? না নিজের শঠতাকে ঢাকার কৌশল? গরীব মেয়েটার হাতে টাকা দিয়ে সত্যি তাদের উপকার করল? না পরের ধনে পোদ্দারী করে আমার কাছে মহত্ব প্রকাশ করল। উপরে এসে চাচি আম্মাকে নামায পড়তে দেখে সেও অজু করে নামায

ঃ বলুন। তারপর বিদায় নিয়ে আনিসাদের বাসায় ফিরে এল।

গুলজার আজ অফিস যাইনি। জিজ্ঞেস করল, কিরে মিমাংসা হল।?

ঃ আজ কিছু অগ্রসর হয়েছে, কাল ফাইন্যাল হবে।

পরেরদিন ব্যারিষ্টার মুস্তাকের তত্বাবধানে কোর্ট ম্যারেজের পর কাজী অফিসে গিয়ে শরামতে তাদের বিয়ে সম্পন্ন হল।

ইয়াসিন সাহেব মেয়েকে বললেন, আজ অন্ততঃ শাকীল আমাদের বাসায় থাক। কাল না হয় চলে যাবে।

শাকিলা বলল, তা হয় না বাবা, তোমাকে তো আমাদের দুজনের চুক্তির কথা বলেছি।

ইয়াসিন সাহেব বললেন, সেটা তোদের স্বামী স্ত্রী হবার চুক্তি। জামাই হিসাবে আমার বাসায় না গেলে ও বন্ধুর ছেলে হিসাবে যাবে। তারপর শাকীলকে বললেন, তুমি কি তোমার বাবার বন্ধুর কথা রাখবে না?

শাকীল বলল, বাবার বন্ধু বাবার সমান। আপনার কথা অমান্য করে বেয়াদবি করতে পারব না।

সেদিন শাকিলাদের বাসায় খেয়ে দেয়ে শাকীল বোনের বাসায় ফিরে এল। রাতে গুলজারকে বলল, আমি কাল চলে যাব।

ঃ তা না হয় যাবি, কিন্তু উইলের ব্যাপারে আজ ফাইন্যাল মিমাংসা হবার কথা ছিল না?

ঃ ছিল, হয়ে ও হল না। তবে একটা ব্যবস্থা অবশ্য হয়েছে, যার নিষ্পত্তি একবছর পর হবে।

বুঝলাম না, খুলে বল।

ঃ তোদের বোঝার দরকার নেই। এখন খুলে বলতে ও পারব না।

পরেরদিন শাকীল বাড়ী গেল।

সুরাইয়া খাতুন এবার ছেলের মন ভার ভার দেখে একসময় জিজ্ঞেস করলেন, কিরে তোর মন খারাপ কেন? অসুখ বিসুখ করেনি তো?

শাকীল মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, না মা, ওসব কিছু হয়নি।

ঃ তাহলে তোর মন খারাপ কেন? নিশ্চয় কিছু চিন্তা করছিস?

ঃ কি আবার চিন্তা করবো।

ঃ তা না হয় কিছু চিন্তা করছিস না; উইলের ব্যাপারে কিছু চিন্তা ভাবনা করেছিস?

ঃ আমি আর কি ভাববো? যাদের ভাবনা তারা ভাববে।

ঃ তোর আব্বার বন্ধু তো চিঠি দিয়ে তোকে জামাই করবে বলে চিঠি দিয়ে আমাদের মতামত জানতে চেয়েছিল। আমরা মত দিয়েছি। ছেলের কপালে চিন্তার রেখা দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তুই কি অসন্তুষ্ট হলি?

ঃ তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট হব, একথা ভাবতে পারলে আম্মা?

ঃ ভাবিনি বলেই তো তোকে জিজ্ঞেস না করে মতামত জানিয়েছি। তা ছাড়া তোর দাদীকে জিজ্ঞেস করতে উনি বললেন, তুই তাকে বলেছিস, মেয়ে তোর পছন্দ। আমার কথা শুনে তোকে চিন্তা করতে দেখে জিজ্ঞেস করলাম।

ঃ কি জান আম্মা, আব্বার বন্ধু চাইলে ও শাকিলা, মানে উনার মেয়ে আমাকে পছন্দ করে না।

ঃ কেন? তুই তো কোন মেয়ের অপছন্দ করার মত ছেলে না। তা হলে মেয়ে কি কোন ছেলেকে ভালবাসে?

ঃ আমার তা মনে হয় না। অন্য কোন কারণ থাকতে পারে।

ঃ মেয়ের অমতের কথা তার বাবা জানে?

ঃ জানে।

ঃ তবু কেন সে তোকে জামাই করতে চায়?

ঃ তা আমি কি করে বলবো।

ঃ আচ্ছা, তুই এত খবর জানলি কি করে?

ঃ উইল হাতে পাবার পর সে একবার মেহেরপুরে গিয়ে কয়েক দিন ছিল। তখন উইলের কথা তুলে আমাকে বলেছিল।

ঃ সে কথা এতদিন বলিসনি কেন?

ঃ দরকার মনে করিনি বলে বলিনি। তবে এবার ঢাকা গিয়ে একটা ফাইন্যাল ব্যবস্থা করে এসেছি।

ঃ কি করেছিস শুনি?

ঃ সে কথা এখন আমি বলতে পারব না। আব্বার বন্ধু নিশ্চয় দু চার দিনের মধ্যে জানাবেন।

দুতিন দিন বাড়ীতে থেকে শাকীল মেহেরপুরে ফিরে এল।

একদিন চেয়ারম্যানের একজন লোক এসে শাকীলকে ডেকে নিয়ে গেল।

চেয়ারম্যান তাকে যথেষ্ট সম্মান দেখিয়ে বসালেন। তারপর বললেন, আমার শালা দু বছর আগে বি, এ, পাশ করে বেকার রয়েছে। অনেক চেষ্টা চরিত্র করে ও চাকরি পাইনি। সে পেপারে চৌধুরী মেমোরিয়াল বিদ্যালপীঠে একজন শিক্ষক দরকার বিজ্ঞাপন দেখে আমাকে এসে ধরেছে। আপনি যদি তাকে এই প্রতিষ্ঠানে উক্ত শিক্ষকের পদে নিয়োগ করতেন, তা হলে বড় উপকৃত হতাম।

শাকীল বলল, আমি তো নিয়োগ করার কেউ না। কমিটি যা করবে তাই। তারা ইন্টারভিউ নেবেন। ইন্টারভিউতে এলাও হলে নিশ্চয় উনি চাকরি পাবেন।

চেয়ারম্যান বলেলন, সে তো অফিসিয়াল ফর্মালিটি। আজকাল ফর্মালিটি মেনে কোথাও কোন কাজ হয় না। আন অফিসিয়ালি সব কিছু হচ্ছে। আপনি কমিটিকে সুপারিশ করলে তারা না নিয়ে পারবে না।

শাকীল বলল, আপনার কথা হয়তো ঠিক। কিন্তু যাকে আমি চিনি না, জানি না, তার জন্য কি করে সুপারিশ করবো? তাছাড়া এই প্রতিষ্ঠানে কারুর সুপারিশ চলবে না। সে কথা সংবিধানে লেখা আছে। এক কাজ করুণ, উনাকে অফিস থেকে দশ টাকা দিয়ে একটা ফর্ম নিয়ে দরখাস্ত করতে বলুন। তারপর ইন্টারভিউ দেবার পর কমিটি যা করার করবে।

চেয়ারম্যান আমজাদ এই এলাকায় প্রায় পনের বছর চেয়ারম্যানি করছেন। উনার আগে উনার বাবা ও চেয়ারম্যান ছিলেন। উনি খুব অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন। ধর্ম কর্ম ও মেনে চলতেন। উনার চার মেয়ে হবার পর আমজাদ। তারপর আর কোন ছেলে মেয়ে হয় নি। তাই আমজাদ সকলের আদর পেয়ে মানুষ হয়েছেন। আই,এ পাশ করে আর পড়েন নি। গ্রামের খারাপ ছেলেদের সঙ্গে বেলাইনে চলাফেরা করতেন। উনার বাবা জানতে পেরে বিশ বছর বয়সে ছেলের বিয়ে দিয়ে দেন। বিয়ের পর কিছুদিন একটু ভাল ভাবে চলেছিলেন। তারপর আগের মত চলাফেরা করতেন। বাবা মারা যাবার পর বাবার সুনামের জোরে এবং টাকা পয়সার জোরে এতদিন চেয়ারম্যানি করে আসছেন। সরকারের টাকা পয়সা অল্পকিছু দেশের কাজে ব্যয় করে বাকিটা নিজে খেয়ে খেয়ে আরো ধনী হয়েছেন। কেউ উনার বিরুদ্ধে একটা কথা বলতে সাহস করত না। চৌধুরী স্টেটের নায়েবের সঙ্গে উনার যোগাযোগ ছিল। শাকীল ম্যানেজার হয়ে আসার পর উনার একচেটিয়া প্রভাব নষ্ট হয়েছ। শাকীল শিক্ষিত অশিক্ষিত যুবকদের নিয়ে

একটা সংগঠন করেছে। একটা লাইব্রেরীও করেছে। সেখানে গ্রামের অশিক্ষিত লোকদের প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রতিদিন এশার নামাজের পর কোরান হাদিসের ব্যাখ্যা ও ধর্মের অনুশীলন শিক্ষা দেওয়া হয়। সন্ধ্যের পর হীরু সংগঠনের ছেলেদের আত্মরক্ষা মূলক সব রকমের কলা কৌশল শিক্ষা দেয়। গ্রামের বিচারে আচারে সংগঠনের ছেলেদের সঙ্গে শাকীল ও থাকে। সরকার থেকে যা কিছু সাহায্য আসে, চেয়ারম্যান ও মেম্বাররা তা থেকে নিজেরা আর আত্মসাৎ করতে পারেন না। সারা ইউনিয়ানের ছোট বড় সকলের মুখে শুধু শাকীলের গুণগাণ। প্রথম দিকে চেয়ারম্যান ও মেম্বাররা সহ্য করতে না পেরে শাকীলকে খুন করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ফজুর সতর্কতায় তা করে উঠতে পারেনি। তবু শাকীল বেশ আহত হয়েছিল। সুস্থ্য হবার পর শাকীল খুব বুদ্ধি করে ছদ্মবেশে খুনিদেরকে ডাকাতির প্রলোভন দেখিয়ে একদিন একজায়গায় জমায়েত করে। তারপর ছদ্মবেশ খুলে বলল, এখন নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, কেন আপনাদেরকে এখানে জামায়েত করেছি। শাকীলকে চিনতে পেরে অনেকের মুখ ভয়ে শুকিয়ে গেল। তাদের মধ্যে দুতিন জন শাকীলকে আক্রমন করার জন্য লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ফজু তৈরী ছিল। সেও তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে দুহাতে দুটো পিস্তল নিয়ে তাদের দিকে তাক করে বলল, আর একটু নড়াচড়া করলে লাশ বানিয়ে ফেলব। শাকীল ফজুকে নরম মেজাজে ধমক দিয়ে পিস্তল নামিয়ে নিতে বলে তাদেরকে বলল, আপনারা বসুন। এখানে মারামারি করার জন্যে আসি নি। তাদেরকে দাড়িয়ে থাকতে দেখে শাকীল আবার বলল, কই বুসন। তারা বেগতিক দেখে বসে পড়ল। ফজু ও পিস্তল দুটো যথাস্থানে লুকিয়ে ফেলল। শাকীল বলল, আমরা সকলে মুসলমান। কোরান হাদিসে আছে, এক মুসলমান আর এক মুসলমানের ভাই। কোরান হাদিস যদি বিশ্বাস করেন। তা হলে বলুন, এক ভাই কি আর এক ভাইকে খুন করতে পারে? হাদিসে আরো আছে, আমাদের নবী (দঃ) বলেছেন। " এক মুসলমান যদি অন্য মুসলমানকে খুন করে, তাহলে দুজনেই জাহান্নামে যাবে।" আপনাদেরকে আজ বলতেই হবে, আপনারা মুসলমান কিনা? এবং কোরান হাদিস বিশ্বাস করেন কিনা? তাদেরকে চুপ করে থাকতে দেখে শাকীল কথাটা আবার বলল। খুনীরা লজ্জায় মাথা নিছু করে নিল। দু চার জন সেই অবস্থায় মাথা নেড়ে সায় দিল। শাকীল বলল, তা হলে আপনারা নিজেদের বিবেককে জিজ্ঞেস করে দেখুন, যা আগে করেছেন এবং এখন কেউ কেউ করতে যাচ্ছিলেন, সেটা ন্যায়, না অন্যায়? যাদেরকে আল্লাহ

পাক শ্রেষ্ঠ জাতি করে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন, যারা শ্রেষ্ঠ নবীর শ্রেষ্ঠ উম্মৎ। তারা যদি সামান্য কটা টাকার জন্য মানুষ খুন করে, তাহলে তাদের উপর আল্লাহ'র গজব নাজিল হবে না কেন? আজ মুসলমানরা নিজেদের সার্থের জন্য আল্লাহ ও রসুলের (দঃ) বাণী ত্যাগ করে অন্যায় অবিচার, অত্যাচার, জুলুমের পথে ধেয়ে চলেছে, তাই সারা পৃথিবীতে মুসলমানরা যেমন ঘৃন্য তেমনি অত্যাচারিত ও উৎপীড়িত হচ্ছে। আপনারা গরীব। তা বলে সামান্য টাকার জন্যে আল্লাহ ও রসুলের কথা অমান্য করে মানুষের কথায় আর একজন মানুষকে অন্যায় ভাবে খুন করবেন? আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করে মেহনত করে হালাল রুজী রোজগারের চেষ্টা করুণ। আল্লাহপাক অসীম দয়ালু। তাঁর কোন জীবকে তিনি না খাইয়ে রাখেন না। আপনাদের অভাব –অভিযোগ সুবিধে–অসুবিধে আমাকে জানাবেন। ইনশা আল্লাহ আমি তা যতটা পারি দূর করার চেষ্টা করব। এখন আসুন আমরা আল্লাহ পাকের কাছে তওবা করে ক্ষমা প্রার্থনা করি। জামাতের সঙ্গে দোওয়া চাইলে আল্লাহ পাক কবুল করে থাকেন। তারপর তাদেরকে তওবা পড়িয়ে আল্লাহ পাকের কাছে ক্ষমা চেয়ে আবার বলল, আপনাদেরকে ইচ্ছা করলে আমি পুলিশের হাতে তুলে দেবার ব্যবস্থা করতে পারতাম, কিন্তু করি নাই কেন শুনবেন? আপনারা গরিব, খেটে খাওয়া মানুষ। আপনারা জেলে গেলে আপনাদের স্ত্রী, ছেলেমেয়ে না খেয়ে থাকবে। তাদের অনেক কষ্ট হবে। তাই তা না করে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের (দঃ) বাণী শুনিয়ে সৎপথে আনার চেষ্টা করলাম। আর এই রকম করতে আল্লাহ ও তাঁর রসুল (দঃ) বলেছেন। তাঁদের সেই হুকুম মানার চেষ্টা করলাম। এবার আপনাদের তকদীর। তবে আপনারা যদি আবার এরকম কাজ করেন, তা হলে তখন আর ছেড়ে দেব না। এই ঘটনা তাদের মধ্যে দু একজন চেয়ারম্যানের কাছে বলেছিল। তারপর থেকে চেয়ারম্যান খুব বুঝে সুজে চলেন। এখন শালার ব্যাপারে শাকীলের ঔদ্ধত্বপূর্ণ কথাশুনে খুব রেগে গেলেও সেদিনের ঘটনা স্মরণ করে সামলে নিলেন। মনে মনে চিন্তা করলেন, সুযোগ পেলে তোমাকে ছেড়ে কথা কইব না।

চেয়ারম্যানের শালা মুজিব ফর্ম এনে ফিলাপ করতে গিয়ে ঘাবড়ে গেল। ফর্মে আছে নামায রোজা কর কিনা? সব কলেমা অর্থসহ জান কি না? দৈনিক কতটা সত্য মিথ্যা কথা বল, তার হিসাব। এ ছাড়া ও আরো অনেক কিছু আছে; যা সে জানে না। আবার ফর্মের নিচে বিঃ দ্রঃ দিয়ে লেখা আছে, যদি উপরের প্রশ্নগুলো আপনি না জানেন অথবা জেনে ও

অনুশীলন না করে থাকেন, তা হলে ইন্টারভিউ দেবার আগে সেই সব শিখতে হবে এবং তার অনুশীলন ও করতে হবে।

ফর্মটা দুলাভাইয়ের হাতে দিয়ে বলল, পড়ে দেখুন , এতকিছু করতে ও পারব না আর চাকরি ও আমার হবে না।

চেয়ারম্যান ফর্মটা একবার পড়ে শুধু হুঁ বলে চুপ করে রইলেন। তিনি জানতেন এভাবে আপটুডেট শালার চাকরি হবে না। তাই শাকীলকে ধরেছিলেন। কিন্তু সে আমার কথা শুনল না। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, আমি ও তাকে একদিন না একদিন দেখে নেব।

চৌধুরী সাহেবের কথায় শাকীল যে প্রতিষ্ঠান গড়েছে, সেখানে বাংলা, ইংরেজী, গণিত ও আরবি এই চারটি ভাষা সমানভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। এটাকে একটা নিউস্কীম মাদ্রাসা বলা যায়। তবে মাদ্রাসায় যেমন শুধু মুসলমান ছেলে মেয়ে পড়ে এবং মুসলমান শিক্ষক শিক্ষকতা করেন, এখানে তেমন না। হিন্দু ছাত্র ছাত্রীরাও পড়ে। আর দু তিনজন হিন্দু শিক্ষকও আছেন। হিন্দু ছাত্রদের সংস্কৃত পড়াবার জন্য একজন পন্ডিত মশাইও আছেন। প্রতিষ্ঠানটা প্রথমে অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত চালু করা হয়। এ বছর দশম শ্রেণী পর্য্যন্ত চালু করার জন্য কমিটির মেম্বারদের সঙ্গে শাকীলও চেষ্টা চরিত্র চালাচ্ছে। সেই ব্যাপারে শিক্ষা বোর্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য শাকীল ঢাকায় এল। ছোট বোনের বাসায় থেকে সে শিক্ষা বোর্ডে ছুটছুটি করতে লাগল।

একদিন গুলজার বলল, চল আজ চিড়িয়াখানা দেখতে যাই। সেখানে আনিসা ছিল। স্বামীর কথা শুনে বলল, সেই কবে একবার দেখেছিলাম, আমিও যাব। তাদের এখনো কোন ছেলেমেয়ে হয়নি। দুপুরে খেয়ে দেয়ে জোহরের নামায পড়ে তিনজনে একটা বেবীটেক্সী করে চিড়িয়াখানা দেখতে গেল। দেখতে দেখতে তারা যখন বিলের ধারে একটা বেঞ্চে বসে অতিথি পাখি দেখছিল তখন গুলজার বলল, তোরা বসে গল্প কর, আমি ল্যাটরিন থেকে আসি।

শাকীল বলল, এখানে আসার প্রোগ্রাম তো সকালে হয়েছিল, দুপুরে কম করে খেতে পারলি না। খাবার সময় মুড়িঘন্ট ভাল হয়েছে বলে পুরো হাঁড়ি সাফ করে দিলি। তুই সেই আগের মত পেটুক রয়ে গেছিস।

আনিসা বলল, বল বল আরো বল। জান ভাইয়া, যেদিন বিরানী বা মোরগ পোলাও হবে, সেদিন এত খাবে যে, ওকে বেশ কয়েকবার পায়খানায় দৌড়াতে হয়।

গুলজার চোখ পাকিয়ে স্ত্রীকে বলল, ভাইয়াকে পেয়ে সাহস খুব বেড়ে গেছে না? বাসায় গিয়ে মজা দেখাব।

শাকীল বলল, তোরও তো সাহস কম না? আমি থাকতে আমার বোনকে মজা দেখাবি। আমিও তোকে মজা দেখাব। এখন যেথা যাচ্ছিস যা। দেরী করলে মুড়িঘন্টা নিচের দিক থেকে বেরিয়ে কাপড় না খারাপ হয়ে যায়। কথা শেষ করে শাকীল হেসে উঠল। সেই সঙ্গে আনিসাও হাসতে লাগল।

তাদের হাসতে দেখে গুলজার রেগে মেগে কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারল না। কারণ তখন তার পায়খানার বেগ খুব জোর করেছে। আমিও এই অপমানের শোধ তুলবো বলে পায়খানার দিকে দ্রুত হাঁটা দিল।

গুলজার চলে যাবার পর শাকীল আনিসাকে স্কুল লাইফের বন-ভোজনের কথা বলে খুব হাসাহাসি করছিল। বনভোজনে খেতে খেতেই গুলজার কাপড় খারাপ করে ফেলেছিল। সেই কথা শুনে আনিসা হাসি চেপে রাখতে পারছিল না। শাকীল যত তাকে ধমকায়, আনিসা তত হাসিতে ভেঙ্গে পড়ে।

ঐ দিন শাকিলা বান্ধবী চৈতীর জিদে চিড়িয়াখানা দেখতে এসেছে। জলহস্তি দেখে তারা ও বিলে অতিথি পাখী দেখার জন্য সেদিকে আসতে আসতে ওদের দুজনের হাসি শুনে শাকিলা থমকে দাঁড়িয়ে তাদের দিকে তাকাতে শাকীলকে চিনতে পারল। তখন আনিসা হেসে হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে, আর বারে বারে শাকীলের গায়ে ঢলে পড়ছে। শাকীল তাকে ধরে মিষ্টি ধমক দিয়ে হাদিসের কথা উল্লেখ করে বলছে, "আল্লাহ পাকের রসুল (দঃ) নারী পুরুষ সবাইকে জোরে হাসতে নিষেধ করেছেন। বেশী হাসলে নীলে আল্লাহ'র ভয় কমে যায়। " হাদিসের কথাগুলো শাকিলার কানে গেল না। সে তখন আনিসার দিকে লক্ষ্য করছে। মেয়েটা বোরখা পরে থাকলে ও তার মুখ দেখে বুঝতে পারল, মেয়েটা অপূর্ব সুন্দরী যুবতী। তাকে ধরে শাকীলকে আদরের ধমক দিতে শুনে শাকীলার মন ঘৃণায় ভরে উঠল। তার প্রতি রাগ ও কম হল না।

বান্ধবী চৈতী ও ঘটনাটা দেখছিল। বলল, ওদেরকে চিনিস নাকি?

শাকিলা বলল, ছেলেটাকে চিনি। চল আমরা অন্যদিকে যাই।

সেদিন বাড়ীতে ফিরে শাকীলা শাকীলের কথা চিন্তা করতে লাগল। ছেলেটা সত্যি তাহলে চরিত্রহীন। শহরে এসে ফস্টি নষ্টি করে আর

কর্মস্থলে বক ধার্মিক। মেহেরপুরে গিয়ে শাকীলের কার্য্যকলাপ ও গুণাগুন দেখে শুনে শাকিলার মন তার প্রতি যতটা না নরম হয়েছিল। আজকের ঘটনা দেখে তার চেয়ে শতগুণ বেশী রাগ ও ঘৃণা জন্মাল। ভাবল, কোনরকমে এক বছর পার করতে পারলেই বাছাধনকে মেহেরপুর ষ্টেট থেকে কুকুরের মত তাড়িয়ে দেব।

পরের দিন শাকিলা ভার্সিটি থেকে ফেরার সময় যাদু ঘরের গেটে শাকীলকে ও সেই মেয়েটিকে বেবী থেকে নামতে দেখে গেট থেকে একটু দূরে গাড়ী পার্ক করে তাদের দিকে লক্ষ্য রাখল।

শাকীল বেবী ভাড়া দিয়ে রীস্ট ওয়াচের দিকে চেয়ে বলল, গুলজার তো এখনো আসে নি। চল আমরা ভিতরে যাই। অফিসের কাজের চাপে ওর হয়তো আসতে দেরী হবে। তারপর আনিসাকে নিয়ে যাদুঘরে ঢুকল।

আজ আনিসার জিদে শাকীল তাকে যাদুঘর দেখাতে নিয়ে এসেছে। গুলজারের সাথে কথা হয়েছে, সে অফিস থেকে এই সময়ে যাদুঘরের গেটে থাকবে।

ওরা নিচ তলা দেখে দোতালায় যাবার জন্য সিঁড়ি দিয়ে কিছুটা উঠেছে, এমন সময় গুলজার যাদুঘরে ঢুকে তাদেরকে দেখতে পেয়ে শাকীল বলে ডাকল।

শাকীল ঘুরে গুলজারের দিকে তাকিয়ে বলল, তোর ঘড়ির কাঁটা বুঝি আজ স্লো চলছে?

আনিসা ও ঘুরে স্বামীর দিকে তাকাবার সময় মাথা ঘুরে পড়ে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল।

ওপর থেকে শাকীল আর নিচ থেকে গুলজার ইন্নালিল্লাহে বলে তাড়াতাড়ি আনিসাকে ধরতে গেল। শাকীল আগে এসে আনিসাকে দুহাতে তুলে দাঁড় করাতে গিয়ে বুঝতে পারল, সে অজ্ঞান হয়ে গেছে। শাকীল তাকে পাঁজা-কোলা করে তুলে নিয়ে নিচে নেমে গুলজারকে বলল, তুই ধর, আমি গেট থেকে একটা বেবী নিয়ে আসি।

গুলজার আনিসাকে পাঁজাকোলা করে নিল। ততক্ষণ দর্শকরা কি হল ভাই কি হল বলে ভীড় জমিয়েছে। শাকিলা ও এতক্ষণ তাদেরকে ফলো করছিল। মেয়েটাকে পড়ে যেতে সেও দেখেছে। শাকীল বেবী আনতে চলে যেতে এগিয়ে এসে গুলজারকে বলল, গেটে আমার গাড়ী আছে। ওখান

পর্য্যন্ত নিয়ে যেতে পারবেন? তা না হলে দরজার কাছে দাঁড়ান, আমি গাড়ী নিয়ে আসছি।

গুলজার ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, শাকীল বেবী আনতে গেছে। আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না।

শাকিলা জিজ্ঞেস করল, এই মহিলা আপনার কে?

ঃ স্ত্রী।

ঃ আর যিনি বেবী আনতে গেলেন?

ঃ আমার স্ত্রীর বড় ভাই।

কথাটা শুনে শাকিলা চমকে উঠল। মনে মনে খুব লজ্জাও পেল। গতকাল থেকে কিছুক্ষণ আগে পর্য্যন্ত শাকীলের উপর যে রাগ ও ঘৃণা হয়েছিল, তা উবে গিয়ে তার মনে তখন অনুশোচনা হল। না জেনে শাকীলকে চরিত্রহীন ভাবা উচিৎ হয় নি। ওরা কথা বলতে বলতে দরজার কাছে চলে এসেছে। শাকীলকে বেবী নিয়ে আসতে দেখে শাকিলা দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়ল।

শাকীল বেবী থেকে নেমে দৌড়ে সিঁড়ি ভেঙ্গে এসে বলল, তুই নিয়ে যেতে পারবি, না আমাকে দিবি?

গুলজার বলল, তুই নে, আমি নার্ভাস ফিল করছি।

শাকীল আনিসাকে নিয়ে বেবীর কাছে এসে বলল, তুই উঠে বস। তারপর আনিসাকে বেবীতে বসিয়ে তাকে ধরে রাখতে বলে সে ড্রাইভারের পাশে বসে বলল, তাড়াতাড়ি মেডিকেলে চলুন।

মেডিকেল ইমার্জেন্সীতে একজন মহিলা ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, ইনি মা হতে চলেছেন, তাই এ রকম হয়েছে। ভয়ের কিছু নেই। একটু সাবধানে রাখবেন। তারপর একটা ইনজেকসান পুশ করে বললেন, একটু পরে জ্ঞান ফিরে আসবে। আর কোন ওষুধ পত্র লাগবে না।

আনিসার জ্ঞান ফেরার পর বাসায় এসে শাকীল তাকে বলল, তোর বুদ্ধি শুদ্ধি এখনো হল না। এই সময়ে কাল চিড়িয়াখানা গেলি, আবার আজ যাদুঘর দেখতে কোন সাহসে গেলি? তারপর গুলজারকে বলল, তুই একটা নীরেট গাধা। বাপ হতে যাচ্ছিস, সে খবর রাখতে পারিস না? ওর এখন কোন পরিশ্রমের কাজ করা চলবে না। ওকে আমি দেশে নিয়ে যাব।

ভাইয়ার কথা শুনে আনিসা খুব লজ্জা পেয়েছে। মাথা নিচু করে বলল, এখানে আমি তো কোন ভারী কাজ করি না, কাজের মেয়েটাই সবকিছু করে। দেশে গেলে ওর খাওয়া দাওয়ার কষ্ট হবে। যখন অসুবিধে হবে তখন ওর সঙ্গে যাব।

শাকীল একটু রাগের সঙ্গে বলল, আমার কথা যখন শুনবি না তখন যা ইচ্ছা তাই কর। আম্মা শুনলে তোকে সঙ্গে করে নিয়ে যাইনি বলে আমাকেই বকাবকি করবে।

গুলজার স্ত্রীকে বলল, শাকীলের সঙ্গে গিয়ে কয়েক দিন না হয় থেকে এস না। কাজের মেয়েটা তো রান্নাবান্না সবকিছু করতে পারে।

আনিসা বলল, না, আমি যাব না। কাজের মেয়ের কথা যে বলছ, তার হাতের কিছু তুমি খাও?

শাকীল গুলজারকে বলল, তোদের ঝগড়া রাখ। এক কাজ কর, মাস খানেকের ছুটি নিয়ে দুজনে একসঙ্গে দেশ থেকে ঘুরে আয়।

গুলজার বলল, তাই করবো।

শাকীল আরো দুদিন থেকে আনিসাকে সাবধানে থাকতে বলে বাড়ীতে এসে আনিসার কথা জানাল।

সুরাইয়া খাতুন বললেন, প্রথম অবস্থায় তিন চার মাস খুব সাবধানে থাকতে হয়। তুই তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলি না কেন?

শাকীল বলল, আমি তো আনতে চেয়েছিলাম, গুলজারের অসুবিধে হবে বলে তোমার মেয়ে এল না। গুলজারকে বলে এসেছি, সে যেন এক মাসের ছুটি নিয়ে আনিসাকে সঙ্গে করে এসে বেড়িয়ে যায়।

ঐদিন শাকিলা বাসায় এসে শাকীলের কথা অনেক চিন্তা করল। যতবার তার সঙ্গে কথাবার্তা এবং মেহেরপুরের ও চৌধুরী স্টেটের সমস্ত লোকজন তাকে যে ভক্তি শ্রদ্ধা করে, সে সব গভীর ভাবে পর্য্যালোচনা করে শাকিলার মনে হল, শাকীল একটা মহৎ ছেলে। সঙ্গে সঙ্গে শিশু একাডেমীর ঘটনাটা মনে পড়তে সন্দেহটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। হঠাৎ তার খেয়াল হল, চিড়িয়াখানার ঘটনার মত তেমন কোন ঘটনা ঘটেনি তো? তখন তার শাকীলের একটা কথা মনে পড়ল-"আমরা বাহ্যিক দৃষ্টিতে যে ঘটনা ঘটতে দেখে সত্য বলে মনে করি, অনুসন্ধান করলে অনেক সময় তা মিথ্যা বলে প্রমানিত হয়।" তাহলে শাকীল কি সেদিন এ ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে বলেছিল। আর একবার মেহেরপুর গিয়ে তাকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

আট

শাকীল বাড়ীতে চার পাঁচ দিন থেকে মেহেরপুর রওয়ানা দিল। চৌধুরী সাহেবের কথামত সে একটা পিস্তল সব সময় সঙ্গে রাখে। বাস থেকে নেমে রিক্সায় করে শাকীল যখন বিলের পাড়ের রাস্তা দিয়ে আসছিল-তখন মাগরিবের নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেছে। চৌধুরী বাড়ীতে পৌঁছাতে পৌঁছাতে ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাবে। তাই রিক্সাওয়ালাকে বলল, তুমি একটু দাঁড়াও ভাই, আমি নামাযটা পড়ে নিই। সে জন্যে ভাড়া বেশী দেব।

রিক্সাওয়ালা শাকীলকে চেনে। বহুবার তাকে এনেছে। বলল, না সাহেব ভাড়া বেশী দিতে হবে না। আমি ও নামায পড়ব।

শাকীল আলহামদু লিল্লাহ বলে বলল, এস, বিলের পানিতে অজু করে দুজনে একসঙ্গে নামায পড়ে নিই। বিলের পাড়ে ঘাসের ওপর মসল্লা বিছিয়ে শাকীল রিক্সাওয়ালাকে নিয়ে নামাযে দাঁড়াল।

রিক্সাওয়ালা ফরয ও সুন্নত নামায পড়ে রিক্সার কাছে ফিরে এল।

শাকীল ছোট বেলা থেকে মাগরিবের নামাযের পর ছয় রাকায়াত আওয়াবিন নামায পড়ে। সেই নামায পড়তে তার একটু দেরী হতে লাগল। নামায শেষ করে মসল্লা নিয়ে যখন সে ফিরে আসার জন্য উদ্দত হল-তখন পাশের জঙ্গল থেকে একজন লোক শাকীলের পিছন থেকে পিস্তল দিয়ে তিন বার ফায়ার করল। প্রথম গুলিটা শাকীলের পিঠে লাগতে হুমড়ী খেয়ে পড়ে গিয়ে ক্রল করে দ্রুত সরে যেতে লাগল। ফলে পরের গুলিগুলো তাকে লাগে নি।

গুলির শব্দ পেয়ে রিক্সাওয়ালা শাকীলের দিকে ছুটে আসার সময় দেখল, একটা কোর্ট প্যান্ট পারা লোক জঙ্গলের ভেতর দিয়ে বাস স্ট্যান্ডের দিকে দ্রুত হেঁটে চলে যাচ্ছে। তাকে ধরতে গেলে সে যদি আবার আমাকে গুলি করে, সেই কথা ভেবে রিক্সাওয়ালা শাকীলের কাছে ছুটে এল।

রক্তে শাকীলের জামা কাপড় ভিজে যাচ্ছে। সে শক্তিশালী যুবক। তাই গুলি খেয়েও উঠে দাঁড়িয়ে ঘাতককে ফলো করতে গিয়ে রিক্সাওয়ালাকে দেখে বলল, লোকটা কোন দিকে গেল বলতে পার?

রিক্সাওয়ালা বলল, লোকটা বাস স্ট্যান্ডের দিকে যাচ্ছে। তাকে পিস্তল হাতে করে সেদিকে যেতে দেখে এবং তার জামা কাপড় রক্তে ভিজে গেছে

দেখে রিক্সাওয়ালা বাধা দিয়ে বলল, আপনি তাকে ধরতে পারবেন না, আপনার শরীরের রক্ত বন্ধ করা আগে দরকার।

শাকীল কথাটার সততা উপলব্ধি করে বলল, তোমার গামছা দিয়ে আমার ক্ষতটা কষে বেঁধে দাও।

রিক্সাওয়ালা কোমর থেকে গামছা খুলে বেঁধে দিয়ে তাকে ধরে ধরে এনে রিক্সায় বসাল।

শাকীল বলল, সদর হাসপাতালে চল। মেহেরপুর সদর হাসপাতালে যেতে হলে চৌধুরী বাড়ীর সামনের রাস্তা দিয়ে যেতে হবে। কাছাকাছি এলে শাকীল রিক্সাওয়ালাকে বলল, দারোয়ানকে একটু ডেকে আন।

রিক্সাওয়ালার কাছে ম্যানেজার সাহেব গুলি খেয়েছে শুনে দারোয়ান লাঠি হাতে করে ছুটে এল। কাছে এসে জামা কাপড় রক্তে ভিজে গেছে দেখে চমকে উঠে বলল, কি করে এরকম হল বাবু?

গামছা দিয়ে ক্ষতটা বাধলে ও রক্ত বন্ধ হয়নি। এতক্ষণ রক্তক্ষরণ হয়ে শাকীল ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে আসছে। দারোয়ানের কথার জওয়াব না দিয়ে কোন রকমে ব্রীফকেস ও পিস্তল তার হাতে দিয়ে বলল, আমি সদর হাসপাতালে যাচ্ছি, আপনি নায়েবকে খবরটা দিয়ে এগুলো বেগম সাহেবের কাছে পৌঁছে দিতে বলবেন। তারপর রিক্সাওয়ালাকে বলল, তাড়াতাড়ি হাসপাতালে চল।

দারোয়ানের মুখে খবরটা শুনে নায়েব চমকে উঠল। তারপর ব্রীফকেস ও পিস্তলটা নিয়ে বেগম সাহেবের কাছে গিয়ে সেগুলো টেবিলের উপর রেখে খবরটা জানালেন।

নাগিনা বেগম চমকে উঠে অশ্রুসিক্ত নয়নে বললেন, আমার যাবার ব্যবস্থা করুন।

উনারা আসার আগেই ডাক্তাররা শাকীলকে অজ্ঞান করে তার শরীর থেকে গুলিটা বের করে ব্যান্ডেজ করে দিয়েছেন। বেডে নিয়ে আসার পর নায়েব নাগিনা বেগমকে নিয়ে সেখানে এলেন।

শাকীলকে দেখে নাগিনা বেগম চোখের পানি রোধ করতে পারলেন না। একদৃষ্টে তার মলিন মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। বেশ কিছুক্ষণ পর নায়েবকে দিয়ে ডাক্তারের কাছ থেকে শাকীলের অবস্থা আশংকামুক্ত জেনে ফিরে এলেন।

শাকীল গুলি খাবার কিছুক্ষণ আগে এই রাস্তা দিয়ে থানার দারোগা দুজন সিপাই নিয়ে বাস স্ট্যাসের দিকে যাচ্ছিলেন। দারোগা খুব সৎ ও ধার্মিক। বিলের রাস্তা পার হয়ে সামনের পাড়ার মসজিদে মগরিবের নামায পড়ে করিম মেম্বরের সঙ্গে চৌধুরী স্টেটের ম্যানেজার শাকীলের কথা ও চৌধুরী মেমোরিয়াল বিদ্যাপীঠের কথা আলোচনা করছিলেন। গুলির শব্দ শুনে বললেন, কি ব্যাপার বলুন তো?

করিম মেম্বর বললেন, বিলের দিকে গুলির শব্দ হল বলে মনে হচ্ছে। কিছুক্ষণ আগে শাকীল সাহেবকে রিক্সায় করে যেতে দেখলাম। উনার কোন বিপদ হল না তো? ততক্ষনে ঐ দিকে কিছু লোকের গোলমাল শুনে দারোগা ও করিম মেম্বার এবং আরো কয়েকজন নামাযি বিলের দিকে আসতে লাগল।

যে লোকটা শাকীলকে গুলি করেছিল, সে কিছুটা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এসে রাস্তায় উঠে দ্রুত হেঁটে বাস স্ট্যান্ডের দিকে যাচ্ছিল।

সামনের পাড়ার আক্কাস একটু আগে রাস্তা থেকে কিছু দূরে জমির আলে একটা বাবলা গাছের আড়ালে বদনা নিয়ে পায়খানা করতে বসেছিল। গুলির শব্দ শুনে ভয়ে তার পায়খানা শুটকে গেল। সে তাড়াতাড়ি জমি থেকে রাস্তায় উঠে এল। এমন সময় একজন লোককে বিলের দিক থেকে আসতে দেখে জিজ্ঞেস করল, আপনি তো ঐ দিক থেকে আসছেন, গুলির শব্দ শোনেন নি?

লোকটা বলল, আমার পিছন দিকে কিছু দূরে শুনতে পেয়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলাম।

আক্কাস এই গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষ। আশপাশের অনেককে চেনে। লোকটাকে অচেনা মনে হতে তার পিছনে আসতে আসতে বলল, একটু দাঁড়ান না মিয়া, আপনি কোন গেরামের মানুষ? আপনাকে তো চিনতে পারছি না?

লোকটা যেতে যেতে বলল, আমি ঢাকার লোক। দুদিন আগে ফুপুদের বাড়ী বেড়াতে এসেছিলাম।

আক্কাস বলল, কোন গেরামে আপনার ফুপুর বাড়ী? ফুপার নাম কি?

লোকটা গুইগাঁই করে কি বলল আক্কাস বুঝতে না পেরে তার সন্দেহ হল। সে দৌড়ে লোকটার সামনে এসে পথ আগলে বলল, একটু দাড়ান না

দেখি আপনাকে চিনতে পারি কি না। আপনার ফুফুদের গেরামের নাম কি জান বললেন?

লোকটা রেগে মেগে বলল, আমাকে চেনার দরকার নেই পথ ছাড়। এখানকার গ্রামের যা নাম, আমার মনে থাকে না।

আক্কাস বলল, ফুপার নাম বলুন।

লোকটা আরো রেগে গিয়ে বলল, তুমি তো আচ্ছা লোক, মানুষকে রাস্তায় আটকে জেরা করছ। সর, দেরি করলে বাস পাব না।

আক্কাস বলল, এখন তো ঢাকার বাস নেই। এতো তাড়াহুড়ো করছেন কেন? ঢাকার বাস তো রাত্র ন টায় ছাড়বে।

তাতে তোমার কি বলে লোকটা আক্কাসকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে চলে যেতে লাগল।

আক্কাসের সন্দেহটা আরো বেড়ে গেল। সে তার পিছনে না গিয়ে জমির আল ধরে একটু ঘুর পথে ছুটে নিজেদের পাড়ায় যখন এল তখন দারোগা ও সেপাই অন্যান্য লোকজনদের নিয়ে ঐদিকে আসছিলেন। আক্কাস দারোগাদের কাছে এসে পায়খানা করতে যাওয়া থেকে লোকটার সংগে যা কথা হয়েছে বলল।

দারোগা সাহেব বললেন, সেই লোকটা কি এদিকেই আসছে?

আক্কাস বলল, হ্যাঁ।

দারোগা সাহেব সবাইকে রাস্তা ছেড়ে গা ঢাকা দিতে বলে নিজে সিপাই দু'জনকে নিয়ে রাস্তার ধারে ওৎ পেতে রইলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যে লোকটা কাছে আসতে দারোগা সামনে এসে পিস্তল তাক করে বললেন, দু'হাত তুলে দাড়ান।

লোকটা চমকে উঠে ছুটে পালাতে গেল, কিন্তু সফল হলো না। ততক্ষণ সিপাহী দু'জন তার সামনে পথরোধ করে দাড়িয়েছে। লোকটাকে পিস্তল বের করতে দেখে দারোগা নিজের পিস্তলের বাঁট দিয়ে সজরে তার মাথায় আঘাত করলেন। লোকটা মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল, সিপাহী দু'জন তাকে ধরে পিস্তল কেড়ে নিয়ে হ্যান্ডকাপ পরিয়ে দিল। তারপর দারোগা সাহেব লোকটার হাতে পায়ের গাঁটে গাঁটে রুলের বাড়ি মেরে স্বীকারোক্তি করলেন। আমজাদ চেয়ারম্যান তার শালাকে দিয়ে এই কাজ করানোর জন্য তাকে প্রচুর টাকা পয়সা দিয়ে ঢাকা থেকে আনিয়েছেন।

দারোগা সাহেব চেয়ারম্যান ও তার শালাকে এরেষ্ট করে চৌধুরী বাড়ীর কাচারিতে এলেন। নায়েব খবর পেয়ে বেরিয়ে এলেন।

দারোগা খুনিদের এরেষ্টের কথা জানিয়ে শাকীলকে দেখতে চাইলেন।

নায়েব বললেন, উনি সদর হাসপাতালে গেছেন। আমি বেগম সাহেবকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করছি।

দারোগা বললেন, ঠিক আছে আপনারা যান, আমি খুনিদের থানায় রেখে আসছি।

পরের দিন শাকীলের গুলি খাওয়ার কথা গ্রামের লোক জানতে পেরে তাকে দেখার জন্য হাসপাতালে ভীড় জমাল। দারোয়ান গেট বন্ধ করে প্রধান কর্তৃপক্ষকে জানাল। তিনি গেটের কাছে এসে অবাক। তিনি এর আগে কোন দিন রুগী দেখতে একসঙ্গে এতলোক আসতে দেখেন নি। বললেন, রুগীর অবস্থা ভাল নয়। উনি অজ্ঞান হয়ে আছেন। আপনারা তিন চার দিন পরে আসুন।

নাগিনা বেগম নায়েবকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিদিন শাকীলকে দেখতে যাচ্ছেন। শাকীলের খুব জ্বর, মাথায় বরফ দিতে হচ্ছে। একদিন ফেরার পথে নাগিনা বেগম নায়েবকে বললেন, শাকীলের বাবা মাকে খবরটা দিলে হত না?

নায়েব বললেন, শুনেছি উনার বাবার শরীর তেমন ভাল নয়। ছেলের খবর শুনে যদি হার্টফেল করেন। তার চেয়ে কয়েক দিন পরে কি রকম থাকেন না থাকেন দেখে খবর দেওয়া যাবে।

যাদুঘরের ঘটনার দিন শাকিলা বাবাকে জানিয়েছিল সে মেহেরপুর যাবে। মেয়ের কথা শুনে ইয়াসিন সাহেব শাকিলা ও শাকীলের বিয়ের কথা সবিস্তারে নাগিনা বেগমকে জানিয়েছিলেন। শাকীল আহত হবার পরের দিন নাগিনা বেগম শাকিলাকে পাঠাবার জন্য ইয়াসিন সাহেবকে টেলিগ্রাফ করতে নায়েবকে বলেছিলেন। টেলিগ্রাফ পেয়ে ইয়াসিন সাহেব মেয়ের হাতে দিয়ে বললেন, কি ব্যাপার দেখত মা।

শাকিলা টেলিগ্রাফটা পড়ে শুনাল।

ইয়াসিন সাহেব অবাক হবার ভ্যান করে বললেন, হঠাৎ তোর চাচি আম্মা ডেকে পাঠাল কেন? যাবি নাকি? তুইওতো কয়েক দিন আগে যাবি বলে বলেছিলি।

শাকিলা তখন চিন্তা করছে চাচি আম্মা আমাকে ডেকে পাঠালেন কেন? তাহলে কি শাকীলের কোন কঠিন অসুখ-বিসুখ হয়েছে। তখন তার শাকীলের বিয়ের শর্তের কথা মনে পড়ল' "মৃত্যু শয্যায় আপনাকে একবার দেখতে চাই।"

মেয়েকে চুপ করে থাকতে দেখে ইয়াসিন সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, কিরে কিছু বলছিস না কেন?

শাকিলা বলল, তুমি ড্রাইভারকে গাড়ি রেডি রাখতে বলো আমি কাল সকালে রওনা দেব।

চৌধুরী বাড়ীতে পৌঁছে চাচি আম্মার মুখে শাকীলের কথা শুনে শাকিলা চমকে উঠল এবং সেই সাথে তার মনটা বিষাদে ছেয়ে গেল। পৌঁছাতে সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছিল বলে ঐদিন শাকীলকে দেখতে যেতে পারল না।

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর নাগিনা বেগম শাকিলাকে পাশে বসিয়ে গায়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, আমি শাকীলের সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা জেনেছি এবং আরো জেনেছি তুমি তাকে চরিত্রহীন ভেবে শুধুমাত্র চৌধুরী স্টেটের সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য তাকে বিয়ে করেছ। পুরুষরা সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে চরিত্রহীনের মত কাজ করে ফেললে ও মেয়েদের কাছে স্বামী চিরকাল সম্মানের পাত্র। প্রত্যেক মেয়ের উচিত আল্লাহ ও তাঁর রসুলের পরে স্বামীকে সম্মান করা।

শাকিলা চাচি আম্মার কথা শুনে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, আমাদের বিয়ের কথা আপনি কি শাকীলের কাছ থেকে জেনেছেন?

নাগিনা বেগম বললেন না মা, সে এসব কিছু বলে নি। তোমার আব্বা আমাকে জানিয়েছে।

ঘুমোতে গিয়ে শাকিলার চোখে এক ফোটাও ঘুম এল না। চোখ বন্ধ করলেই শাকীলের আনিন্দ সুন্দর মুখটা ভেসে উঠে। এপাশ ওপাশ করতে করতে এক সময় বিছানা থেকে নেমে শাকীলের রুমে এল। টেবিলের উপর বেশ কিছু বই গুছানো রয়েছে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এসে বইগুলো দেখতে দেখতে একটা ডায়েরী পেল। ডায়েরীর উপরে সুন্দর হাতের লেখায় শাকীলের নাম ঠিকানা দেখে তার মনে ডায়েরীটা পড়ার কৌতুহল জাগল। চেয়ারে বসে ডায়েরীটা খুলে পড়তে লাগল-

দৌলত, সোনা দানা চাই না। তুমি শুধু তোমার ঐ বেহেস্তের হুরসম বান্দিকে এই নান্দান বান্দার স্ত্রীরূপে কবুল করো।" আজ তার সঙ্গে আমার বিয়ে হল। কিন্তু তাকে স্ত্রীরূপে পেলাম না। আজ আমাদের বাসর রাত হবার কথা। এই রাতের জন্য আল্লাহ্ পাকের কাছে কত কেঁদেছি। সেই রাত এল, কিন্তু মানষিকে পেয়েও পেলাম না। নিজেকে সংযত রাখতে না পেরে অজু করে তাহজ্জুদের নামায পড়ে নফল এবাদতে মশগুল হবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সফল হলাম না। শাকিলার মুখটা মনের পর্দায় ভেসে উঠে এবাদতে ব্যাঘাত ঘটাতে লাগল। শেষে কোরাণ শরিফ তেলাওয়াত করতে লাগলাম। কিছুক্ষণের তেলাওয়াত করার পর আবার শাকিলার স্মৃতি মনে পড়ে বাধা সৃষ্টি করতে কোরান তেলাওয়াত বন্ধ করে ডায়েরী লিখতে বসলাম। ঐদিন বিয়ের আগে শাকিলা যখন বলল, তাদের পূর্বপুরুষদের সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য এক বছরের কন্ট্যাক্টে বিয়ে করবে তখন আমার মনে হল, এর থেকে সে যদি এক পেয়ালা বীষ পান করার জন্য আমার হাতে তুলে দিত, তা হলে আমার মনে অনেক কম ব্যথা লাগত। সমস্ত পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য একদিকে আর অন্যদিকে শাকিলাকে রেখে কেউ যদি আমাকে বলতো-যেটা ইচ্ছা নাও। তখন আমি তাকেই নিতাম। উইল পাবার পরপর আমি উকিলদের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলাম-আমাকে বিয়ে না করে যাতে সে সম্পত্তির মালিক হতে পারে। তারা বললেন, উইল মোতাবেক তার সঙ্গে আমার বিয়ে না হলে এবং একবছর তা টিকে না থাকলে সে সম্পত্তির মালিক হতে পারবে না। তাই শাকিলা যখন এক বছরের কন্ট্যাক্টে বিয়ে করতে চাইল তখন মেনে নিলাম। আমার মন আমাকে বলে, সেও আমাকে ভালবাসে। কিন্তু হয়তো কোন কারণে চরিত্রহীন জেনে শঠ ও ধূর্ত ভেবে ঘৃণা করে। আমাকে যতই চরিত্রহীন ও ধূর্ত ভাবুক না কেন, তাতে আমার মনে যতটা দুঃখ ও কষ্ট হয়, শঠ ভাবলে তার থেকে হাজারগুণ বেশী মনে কষ্ট হয়। কারণ শঠ মানে মোনাফেক। আর মোনাফেকের স্থান জাহান্নাম। আমি জাহান্নামকে খুব ভয় করি। চরিত্রহীন গোনাহগাররা তাদের গোনাহর দরুণ জাহান্নামের আগুনে পুড়ে একদিন না একদিন বেহেস্তে যাবে। কিন্তু মোনাফেকরা অনন্তকাল জাহান্নামের আগুনে পুড়বে। তাই যেদিন তুমি আমাকে শঠ বলেছিলে, সেদিন রেগে গিয়ে বলতে নিষেধ করেছিলাম।

এতক্ষণ ডায়েরী পড়তে পড়তে শাকিলা চোখের পানিতে বুক ভাসাচ্ছিল। চোখ মুখ মুছে ডায়েরীটা বন্ধ করে হাত ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল, রাত দুটো। ডায়েরীটা নিয়ে নিজের রুমে ফিরে এসে স্টেডিয়ামে

প্রথম সাক্ষাতের পর থেকে যতবার তার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা হয়েছে, সেই সব চিন্তা করে বুঝতে পারল, শাকীল যতবেশী আমাকে ভালবাসে, আমি বোধ হয় তার চেয়ে বেশী তার মনে কষ্ট দিয়েছি। আল্লাহ্ পাকের কাছে জানাল-"আল্লাহ্ পাক তুমি শাকীলকে সুস্থতা দান কর। তাকে শিঘ্রী ভাল করে দাও। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আমি যেন তার কাছে ক্ষমা চেয়ে ধন্য হতে পারি। আমি যে ভুল করেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ দাও। তারপর খাটে শুয়ে ডায়েরীটা আবার পড়তে লাগল-বিভিন্ন তারিখের ঘটনা লেখা-ইন্টারভিউ এর দিন থেকে আহত হবার আগের দিন পর্য্যন্ত প্রতিদিনের ঘটনা পড়তে লাগল। মেসবাহ উদ্দিন চৌধুরী প্রথম জীবনে যাই থাকুন না কেন, শাকীলের সংস্পর্শে এসে ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। চৌধুরী ষ্টেটের সব কর্মচারী ও চাকর চাকরানীদের মনে কি ভাবে ইসলামের আইন অনুস্মরণ করার প্রেরণা জাগিয়েছে, চৌধুরী মেমোরিয়াল বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠার পটভূমিকা, দু দুবার তাকে মার্ডার করার ষড়যন্ত্র এবং তার পরবর্তি ঘটনা, এমন কি গ্রামের দুস্থ ও গরীবদের কি কারণে কখন কাকে কত টাকা দিয়েছে এবং দিতে হবে, প্রতিদিন কোন সময়ে কোন কোন অসুস্থ লোককে দেখতে গেছে এবং যেতে হবে তা সব পড়ল। ডায়েরীটা যত পড়ছে শাকিলা তত শাকীলকে জানতে পারছে, আর সেই সঙ্গে নিজের নিবুর্দ্ধিতার জন্য অনুশোচনায় দগ্ধিভূত হয়ে চোখের পানিতে তা ঠান্ডা করার চেষ্টা করছিল। এমন সময় ফজরের আযান শুনে ডায়েরীটা শাকীলের রুমে রেখে অজু করে নামায পড়ে কেঁদে কেঁদে শাকীলের জন্য অনেক দোয়া চাইল।

সকালে নাস্তা খাবর সময় নাগিনা বেগম শাকিলার দিকে চেয়ে বললেন, তোমার কি শরীর খারাপ? চোখ মুখ ফোলা কেন?

ঃ না চাচি আম্মা আমার কিছু হয় নি। রাতে ভাল ঘুম হয় নি, তাই ঐরকম মনে হচ্ছে। খাওয়া শেষ করে বলল, আমি হাসপাতালে যাব।

নাগিনা বেগম কয়েক সেকেন্ড তার মুখের দিকে চেয়ে কিছু বুঝতে পারলেন। বললেন, আমি নায়েবকে খবর পাঠিয়ে সে ব্যবস্থা করছি।

শাকীলা ড্রাইভারকে বলল, তুমি গাড়ী নিয়ে ফিরে যাও। বাবাকে বলবে, শাকীল সাহেবের খুব অসুখ, আমার ফিরতে দেরী হবে। পরে আমি তাকে চিঠি দিয়ে বিস্তারিত জানাব।

আজি পাঁচদিন শাকীল আহত হয়ে হাসপাতালে আছে। জ্বর কমে নি, ক্ষতস্থান ও সারে নি। শাকীলা যখন হাসপাতালে গিয়ে পৌছাল তখন বেলা

সাড়ে দশটা। সবে মাত্র ডাক্তার শাকিলকে পরীক্ষা করে বেরিয়ে গেছেন। এখানে কেবিন নেই। শাকীল প্রথমে ওয়ার্ডে অন্যান্য রুগীদের সঙ্গে ছিল। নাগিনা বেগম নায়েবকে দিয়ে অনেক টাকার বদলে আলাদা একটা রুমে শাকীলকে রাখার ব্যবস্থা করেছেন। সেখানে এসে দেখল, নার্স শাকীলের গায়ে কম্বল চাপা দিচ্ছে।

তাদের দেখে নার্স নিজের ঠোঁটে একটা আঙ্গুল ঠেকিয়ে ঈশারা করে কথা বলতে নিষেধ করল। তারপর ফিস ফিস করে বলল, খুব কষ্ট হচ্ছিল বলে ঘুমের ইঞ্জেকসান দেওয়া হয়েছে। উনি এখন ঘুমোবেন। তারপর নার্স বেরিয়ে গেল।

শাকিলা নায়েবকে বলল, আপনি চলে যান, আমি এখানে থাকব। উনাকে ইতস্ততঃ করতে দেখে আবার বলল, চাচি আম্মাকে বলবেন, দুপুরের খাবার পাঠিয়ে দিতে।

নায়েব উইলের খবর জানলে ও তাদের বিয়ের কথা জানতেন না। ফিরে আসার সময় চিন্তা করলেন, শাকীল ভাল হয়ে গেলে এবার ওদের বিয়ের ব্যবস্থা করার জন্য বেগম সাহেবকে বলতে হবে।

নায়েব চলে যাবার পর শাকিলা বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে শাকীলের মুখের দিকে চেয়ে রইল। অত সুন্দর স্বাস্থ্যবান ছেলে শুকিয়ে গেছে। চাচি আম্মার কাছে শুনেছে, প্রচুর রক্ত গেছে। তাই চেহারা হলুদ দেখাচ্ছে। আপনা থেকে তার চোখ দুটো পানিতে ভরে উঠল। চোখ মুছে সীটের নিচ থেকে টুল টেনে মাথার কাছে এনে বসে তার কপালে হাত রেখে বুঝতে পারল এখানো বেশ জ্বর রয়েছে। বেলা দুটোর সময় শাকীলকে চাইতে দেখে শাকিলা দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, এখন কেমন বোধ করছেন?

শাকীল কোন কথা বলল না। কয়েক সেকেন্ড শাকিলার মুখের দিকে চেয়ে থেকে চোখ বন্ধ করে নিল। তখন তার দু চোখের কোন দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে।

শাকিলা সাড়ীর আঁচলে শাকীলের চোখ মুছে দিয়ে বলল, কষ্ট কি বেশী হচ্ছে? ডাক্তারকে খবর দেব?

শাকীল কয়েক মূহুর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিল। তারপর শাকিলার দিকে চেয়ে বলল, না, ডাক্তারকে খবর দিতে হবে না। আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বসুন।

শাকিলা বসার পর জিজ্ঞেস করল, কেমন আছেন?

শাকিলা উত্তর দিতে পারল না। মাথা নিচু করে চোখের পানি ফেলতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যে সামলে নিয়ে চোখ মুছে মাথা তুলে বলল, ভাল।

ঃ আমার অসুখের কথা শুনে এসেছেন জেনে খুব খুশী হয়েছি। আল্লাহ্ পাক আমার মনের মকসুদ পূরণ করালেন, সে জন্যে তাঁর পাক দরবারে জানাই লাখলাখ শুকরিয়া।

নার্স এসে রুগীকে কথা বলতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এখন কিরকম লাগছে?

শাকীল কলল, একটু ভাল।

নার্স জ্বর দেখে ওষুধ খাইয়ে যাবার সময় বলল, বেশী কথা বলবেন না।

নার্স চলে যাবার পর শাকীল শাকিলাকে জিজ্ঞেস করল, কবে এসেছেন?

ঃ পরশু চাচি আম্মার টেলিগ্রাফ পেয়ে গতকাল এসেছি। টেলিগ্রাফে আপনার কথা কিছু লেখা ছিল না। শিঘ্রী আসার জন্য বলা হয়েছিল।

ঃ এখানে কখন এলেন?

ঃ সাড়ে দশটার দিকে।

ঃ দুপুরে খেয়েছেন?

ঃ খেয়েছি। এবার আপনি চুপ করুন। নার্স বেশী কথা বলতে নিষেধ করে গেলেন না

আরো আট দশ দিন হাসপাতালে থেকে শাকীল প্রায় সুস্থ হয়ে চৌধুরী বাড়ীতে ফিরে এল। শাকিলা এসে প্রথম রাতটা চৌধুরী বাড়ীতে ছিল। তারপর হাসপাতালে সব সময় থেকে শাকীলের সেবা শুশ্রুষা করেছে।

শাকীলের ফিরে আসার খবর গ্রামের লোক জানতে পেরে, তারা ও তাদের বাড়ীর মেয়েরা তাকে দেখার জন্য কাচারি বাড়ীর সামনের মাঠে ভীড় করল।

নায়েব তাদেরকে অপেক্ষা করতে বলে ভিতর বাড়ীতে খবর পাঠালেন। শাকীল এখনো সম্পূর্ণ সুস্থ্য হয় নি। নায়েব কাচারি বাড়ীর বারান্দায় তার বসবার ব্যবস্থা করলেন। শাকীল সেখানে বসার পর, নায়েব সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আপনারা আজ শুধু দেখে চলে যান। পরে কথা-বার্তা যা বলার বলবেন। উনি এখনো অসুস্থ।

নায়েব থেমে যাবার পর শাকীল সালাম জানিয়ে বলল, সম্পূর্ণ সুস্থ্য হবার পর ইন্শা আল্লাহ্ আমি নিজেই আপনাদের সঙ্গে দেখা করব। অনুগ্রহ করে আজ আপনারা চলে যান। আল্লাহ্ পাক আমাদের সাবাইকে হেফাজাত করুন। তারপর আবার সালাম জানিয়ে নিজের রুমে। ফেরার সময় সেই রিক্সাওয়ালাকে দেখতে পেয়ে তাকে কাছে ডাকালেন। তারপর নায়েবকে বলল, আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছায় এই লোক আমাকে সেদিন একরকম বাঁচিয়েছে। একে পাঁচশো টাকা বখশীস দেবেন। টাকাটা আমার বেতন থেকে কেটে নিতে সরকার চাচাকে বলবেন।

রিক্সাওয়ালা দুহাত জোড়ো করে বলল, মাফ করবেন সাহেব, আমি কোন টাকা নিতে পারব না। আল্লাহ'র রহমতে আপনি বেঁচে গেছেন, সেটাই আমার মস্তবড় বখশীস। তারপর সে লোকের ভীড়ের মধ্যে মিশে গেল।

ঐ দিন রাতে শাকীল নিজের রুমে খাচ্ছে। নাগিনা বেগম পাশে বসে আছেন। শাকিলা খাওয়াচ্ছে আর কাজের মেয়েটা সবকিছু এনে দিচ্ছে।

খাওয়া শেষ হবার পর নাগিনা বেগম সকাল সাকাল ঘুমিয়ে পড়তে বলে উপরে চলে গেলেন। শাকিলা ও উনার সঙ্গে চলে গেল। কাজের মেয়েটা সবকিছু নিয়ে চলে যাবার পর শাকীল ধীরে ধীরে কিছুক্ষণ পায়চারি করল। তারপর ঘুমোবার জন্য খাটে বসে মশারী খাটাবার কথা চিন্তা করছিল। এমন সময় শাকীলাকে রুমে ঢুকতে দেখে তার দিকে তাকাল।

শাকিলা ও রুমে ঢুকে তার দিকে তাকিয়েছিল। তাকাতে চোখে চোখ পড়ল।

শাকীল দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে বলল, বসুন। এসে ভালই করেছেন। কয়েটা কথা বলবো বলে আপনার কথাই মনে করছিলাম।

শাকিলা চেয়ারে বসে বলল, আমিও কিছু বলবো বলে এসেছি।

শাকীল কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল, ঠিক আছে, প্রথমে আমারটা শুনুন।

এই কদিন আমার জন্য আপনি যা করলেন, তা চিরকাল আমার মনে থাকবে। আজীবন আমাকে ঋণে আবদ্ধ করে ফেললেন। আল্লাহ্ পাক জানেন, সে ঋণ আমি কোন দিন শোধ করতে পারব কি না। আমাদের বিয়ের কন্টাক্টের মেয়াদ শেষ হতে আর মাত্র একমাস বাকি। আপনি ঢাকা গিয়ে এর মধ্যে ডিভোর্সের কাগজ পত্র রেডী করে নিয়ে আসুন, আমি সিগনেচার করে দেব। চৌধুরী সাহেবকে আমি কথা দিয়েছিলাম, সারাজীবন

এই স্টেট দেখা শুনা করবো। আমি যখন থাকছি না তখন আর কি করে তা করতে পারি। তাই আপনার অনুমতি পেলে চাচি আম্মা ও নায়েবের সঙ্গে কথা বলে আমি আমার জায়গায় একজন উপযুক্ত লোককে নিয়োগ করে যেতে চাই। তা হলে চৌধুরী সাহেবের কাছে যা ওয়াদা করেছিলাম তার কিছুটা অন্ততঃ রক্ষা করা হবে। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এখানকার পাট মিটিয়ে একেবারে বাড়ী চলে যাব। আমার উইলটা চাচি আম্মার কাছে আছে। উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করে বিষয় সম্পত্তির মালিকানার ব্যাপারে যদি দলিল পত্রে আমার সিগনেচার লাগে, তা হলে সে ব্যবস্থাও করে আনবেন। স্টেটের আয় ব্যায়ের হিসাব নায়েব ও সরকারের খাতা পত্রে আছে। আমি এখানে থাকাকালিন সময়ে যত টাকা পয়সা নিয়েছি এবং যেখানে যা খরচ করেছি, সে সব বুঝে নেবেন। কোন কিছু বুঝতে অসুবিধে হলে, কিংবা সন্দেহ হলে, আমাকে জিজ্ঞেস করবেন। আমার আর কিছু বলার নেই। আব্বা, আম্মা ও দাদীর জন্য আমার মন খুব খারাপ লাগছে। যা কিছু করার এই এক মাসের মধ্যে করলে বাধিত হব।

শাকিলা এতক্ষণ মাথা নিচু করে রুমের মেঝের দিকে চেয়েছিল। শাকীল থেমে যেতে মাথা তুলে তার দিকে চেয়ে ছলছল নয়নে বলল, আমি আপনাকে ভুল বুঝে এতদিন যা কিছু বলেছি বা করেছি, সে জন্যে অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা চাইছি। তারপর সে সামলাতে পারল না, দুহাতে মুখ ঢেকে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

প্রায় দুবছর আগে শাকীল বল খেলা দেখাকে উপলক্ষ্য করে শাকিলার সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাকে ভালবেসে ফেলেছিল। সেই সময় শাকিলার মনের খবর ও কিছুটা বুঝতে পেরেছিল। তারপর তাকে আব্বার বন্ধুর মেয়ে জেনে ভেবেছিল, তাকে পেতে খুব একটা অসুবিধে হবে না। শিশু একাডেমীর সেই অবাঞ্ছিত ঘটনার পর থেকে বিয়ে হওয়া পর্যন্ত শাকিলা তাকে ঘৃণা করলেও তার প্রতি শাকীলের ভালবাসা বেড়েছে বই কমেনি। বিয়ের পর দীর্ঘ এক বছরের মধ্যে শাকীল শাকিলাকে নিয়ে অনেক ভেবেছে। এক বছর পর তাকে চিরকালের জন্য ছেড়ে দিতে হবে মনে পড়লে, তার মন খুব খারাপ হয়ে যায়। এবারে আহত হয়ে হাসপাতালে শাকিলাকে দেখে শাকীলের উত্তপ্ত হৃদয় জুড়িয়ে গেছে। তারপর তার অক্লান্ত সেবা ও নম্র ব্যবহার তার মনে অজানা এক আনন্দের লহরী বইতে শুরু করেছে। প্রথম দেখার পর থেকে সে যেমন শাকিলাকে স্ত্রীরূপে পাবার জন্য সব সময় আল্লাহ্ পাকের কাছে ফরিয়াদ করত, তেমনি বিয়ের পর তার মতিগতি

ভাল করে দেবার জন্যও ফরিয়াদ করেছে। কিন্তু ঘুনাক্ষরে ও শাকীলাকে তা বুঝতে দেয় নি। এখন তার কথা শুনে ও তাকে কাঁদতে দেখে আল্লাহ্ পাক তার দোওয়া কবুল করেছেন বুঝতে পেরে তাঁর শুকরিয়া আদায় করতে গিয়ে শাকীলের চোখ দুটো পানিতে ভরে উঠল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সামলে নিয়ে চোখ মুছে বলল, শঠ ও ধূর্ত লোকের ক্ষমার মধ্যে ও শঠতা থাকে। যারা সৎ ও বুদ্ধিমান, তারা কোনদিন কোন কারণেই শঠ লোকের কাছে ক্ষমা চায় না।

শাকীলা নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না, উঠে এসে শাকীলের পায়ের কাছে বসে বলল, সে সব কথা বলে আমাকে আর লজ্জা দিওনা। আমাকে তোমার এই পবিত্র কদমের সেবা করতে দিয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ দাও। বল, ক্ষমা করে তোমার পায়ে ঠাঁই দেবে? তারপর সে তার পা জড়িয়ে ধরল।

শাকীল তাকে দুহাত দিয়ে তুলে আর একবার আল্লাহ্ পাকের শুকরিয়া আদায় করে তার দুগালে ও কপালে চুমো খেয়ে বুকে চেপে ধরে বলল, তোমার কোন কথা ও কাজকে যদি অন্যায় মনে করতাম, তাহলে আমি যেমন তোমাকে পেতাম না, তেমনি তুমিও আমাকে পেতে না। চল জীবনের প্রথম খুশীর খবরটা চাচি আম্মাকে জানিয়ে তাঁর দোওয়া নিই।

শাকীলা স্বামীর সোহাগের প্রতি উত্তর দিয়ে বলল, না। জীবনের প্রথম খুশীর রাতে কাউকে ভাগ দেব না। শুধু আমরা দুজনে তা ভোগ করবো। যা করার কাল করা যাবে। এখন চল ঘুমাবে। রাত অনেক হয়েছে।

শাকীল তাকে কোলে বসিয়ে ঠোঁটে ঠোঁট রেখে বলল, এই খুশীর রাতে কেউ কোন দিন ঘুমিয়েছে, না ঘুমোতে পেরেছে?

ঃ না তো কেউ পারে না।

ঃ তা হলে বললে কেন?

ঃ এভাবে বসে বসে কি রাত কাটাতে চাও?

ঃ তা হলে শুয়ে শুয়ে কাটাতে চাও?

ঃ তুমি যেভাবে চাও সেইভাবে কাটাব।

ঃ কি ভাবে কাটাতে হয় আমি যে জানি না।

ঃ সে কথা কাউকে জানাতে হয় না।

ঃ তাই?

হ্যাঁ তাই বলে শাকিলা স্বামীকে আদর সোহাগে ভরিয়ে তুলল। এক সময় অশ্রুসিক্ত নয়নে বলল, তুমি শিশু একাডেমীর আসল ঘটনাটা আমাকে যদি সে সময় জানাতে, তাহলে তোমার প্রতি আমি এত দুর্ব্যবহার করতাম না। ভাগ্যচক্রে এখানে এসে তোমার ডায়েরীটা পড়ার সোভাগ্য আমার হয়েছিল। নচেৎ কি যে হত তা আল্লাহ পাক জানেন। তুমি আমাকে এত ভালবাস আর আমি তা বুঝতে না পেরে তোমার মনে কত আঘাত দিয়েছি। সে কথা মনে হলে–কথাটা সে আর শেষ করতে পারল না, ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

শাকীল তাকে বুকে চেপে ধরে আদর দিয়ে বলল, তখন বললে তুমি কথাটা বিশ্বাস করতে না ভেবে জানাই নি। তা ছাড়া তুমি নিজের চোখে ও কানে যা দেখেছ ও শুনেছ, আসল ঘটনা বললেও তোমার বিশ্বাস হত না। ভাবতে অন্যায় করে তোমার কাছে ভাল হবার জন্য সাফাই গাইছি। বাদ দাও ওসব কথা, যা ভাগ্যে ছিল হয়েছে। এখন কান্না থামাও। এই শুভরাত কান্নার মধ্যে দিয়ে কাটাতে চাও না কি? একটু আগে তুমিই তো বললে আজকের রাত শুধু তোমার আমার আনন্দের রাত।

শাকিলা কান্না থামিয়ে চোখ মুখ মুছে আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, আমার অন্যায় হয়েছে মাফ করে দাও। তারপর শাকীলকে জড়িয়ে ধরে বলল, আনন্দ বুঝি আমি একা করবো?

শাকীল তাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে ঠোঁটে ঠোঁট রেখে বলল, তা কেন দুজনেই করব। কথা শেষ করে তারা চির আকাংখিত মধুর মিলনে মেতে উঠল।

সমাপ্ত